সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রকাশকের আভাষ	
অনুবাদকের ভূমিকা	
সম্পাদকের ভূমিকা	
শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র সংক্ষিপ্ত জীবনী	
শাইখ ড. মুহাম্মাদ খলীল হাররাস রাহিমাহুল্লাহ'র সংক্ষিপ্ত জীবনী	
শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ'র সংক্ষিপ্ত জীবনী	
ব্যাখ্যাকার মুহাম্মাদ খলীল হাররাস রাহিমাহুল্লাহ'র ভূমিকা	
প্রারম্ভিকা	
◉ 'বাস্‌মালাহ' বিষয়ক বক্তব্য এবং এ বিষয়ে বিদ্যমান মতভেদের ক্ষেত্রে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত	
◉ 'হাম্‌দ' ও 'মাদ্‌হ' এর ব্যাখ্যা এবং এ দু'টির মাঝে পার্থক্য	
◉ 'রাসূল' এবং 'নবী' এর মাঝে পার্থক্য বিষয়ক বক্তব্যের তাহকীক	
◉ 'হুদা' এর অর্থ এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা দ্বারা গুণান্বিত ও যা দ্বারা গুণান্বিত নন	
◉ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', এর অর্থ এবং দীন ইসলামে এর মর্যাদা	
◉ শাহাদাহ এর অর্থ	
◉ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওপর সালাত এবং সালাতের অর্থ, যদি তা ফেরেশতা বা মানুষের ক্ষেত্রে হয়	
◉ 'আল-আকীদাতুল ওয়াসেত্বিয়্যাহ' কিতাব রচনার পটভূমি	
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের পরিচয়	
◉ আশ'আরী এবং মাতুরীদী সম্প্রদায় আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত নয়	

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
◉ 'ফিরকাতুন নাজিয়াহ' এর পরিচয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অবশিষ্ট থাকা	
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ	
◉ ঈমানের সঠিক অর্থ	
◉ ঈমানের ৬টি রুকন	
◉ মালাইকাহ, কিতাবসমূহ এবং রাসূলগণের ওপর ঈমানের ব্যাখ্যা	
◉ পুনরুত্থান ও তাকদীরের ওপর ঈমানের ব্যাখ্যা	
মহান আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের তরীকাহ	
◉ মহান আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলিকে 'তাহরীফ' (পরিবর্তন), 'তা'ত্বীল' (অর্থশূন্য ও বাতিলকরণ), 'তাকয়ীফ' (ধরণ নির্ধারণ) এবং 'তামসীল' (সাদৃশ্য প্রদান) ব্যতীত সাব্যস্তকরণ	
◉ তাহরীফ এবং তা'ত্বীল, এদের অর্থ, প্রকারভেদ ও এদের মাঝে পার্থক্য	
◉ তাহরীফ এবং তা'ত্বীল এর মধ্যে পার্থক্য	
◉ তাফউয়ীদ্ব এর অর্থ এবং মুফাউয়িদ্বাহ সম্প্রদায়	
◉ তামসীল এবং তাকয়ীফ এর অর্থ এবং এদের মধ্যে পার্থক্য	
◉ তামসীল এবং তাশবীহ এর অর্থ এবং কোনটি ব্যবহার করা উত্তম	
◉ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতির মাধ্যমে মহান আল্লাহর সিফাতসমূহকে সাব্যস্তকরণ	
মহান আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহতে আসা বক্তব্যে যা মানা ওয়াজিব	
◉ মহান আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে 'ইলহাদ' এর ব্যাখ্যা এবং এর প্রকারভেদ	
◉ আহমাদ ইবন হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) এর ব্যাখ্যা	
◉ নু'আইম ইবন হাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ) এর ব্যাখ্যা	
◉ মহান আল্লাহকে তাঁর কোনো সৃষ্টির সাথে তুলনা করা জায়েয নয়	

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
◉ কিয়াসুশ শুমূল (অন্তর্ভুক্তিমূলক যুক্তি), কিয়াসুত তামসীল (সাদৃশ্যপ্রদানমূলক যুক্তি) এবং কিয়াসুল আওলাউইয়্যাহ (সর্বাধিক উপযোগী যুক্তি)	
◉ 'قاعدة الكمال' (পরিপূর্ণতা নীতি)	
◉ মহান আল্লাহর নামসমূহে ইলহাদ চারভাবে হয়ে থাকে	
◉ আর মহান আল্লাহর আয়াতসমূহে ইলহাদ দু'ভাবে হয়ে থাকে	
মহান আল্লাহর নাম ও গুণসমূহকে সাব্যস্ত করা এবং অসাব্যস্ত করার মাঝে একত্রীকরণ	
◉ অর্থের ওপর ভিত্তি করে কোনো কথার দলীল হওয়া	
◉ মহান আল্লাহর সিফাত বা গুণসমূহের প্রকারভেদ	
◉ মহান আল্লাহর সাব্যস্তজাত ও অসাব্যস্তজাত নাম ও গুণের ক্ষেত্রে মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) ও মুফাসসাল (বিস্তারিত) বর্ণনা	
◉ 'আস-সিরাতুল মুস্তাকীম' (সরল-সঠিক পথ) এর অর্থ	
◉ মহান আল্লাহর নামসমূহ নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়	
◉ মহান আল্লাহর নামসমূহের প্রতি আনীত ঈমান কিভাবে পরিপূর্ণ হবে?	
◉ স্থায়িত্ব ও নতুনত্বের দিক থেকে মহান আল্লাহর গুণাবলির প্রকারভেদ	
◉ মহান আল্লাহর সিফাতসমূহকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত পরিসরে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্‌র তরীকাহ	
সুরাতুল ইখলাসে বর্ণিত মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলি	
◉ সূরাতুল ইখলাসে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত অন্তর্ভুক্ত, যা কুরআন মাজীদের এক-তৃতীয়াংশের সমান	
আয়াতুল কুরসীতে বর্ণিত মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলি	
◉ 'আয়াতুল কুরসী' এর ব্যাখ্যা এবং এটি মহান আল্লাহর যেসব সিফাতকে সাব্যস্ত করে	
◉ মহান আল্লাহকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ না করার ব্যাখ্যা	

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
◉ ‘كُرْسِي’ (কুরসী) এর অর্থ	
সূরা আল-হাদীদের ৩নং আয়াতে বর্ণিত মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলি	
◉ ‘الأَوَّلُ’ (আল-আওয়াল), ‘الآخِرُ’ (আল-আখির), ‘الظَّاهِرُ’ (আয-যাহির) এবং ‘الْبَاطِنُ’ (আল-বাত্বিন) এর অর্থ	
◉ মহান আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার অর্থ এবং অন্য কারো উপর তাওয়াক্কুলের বিধান	
মহান আল্লাহর জ্ঞান	
◉ ‘ইলম’ (জ্ঞান) মহান আল্লাহর একটি সত্তাগত স্থায়ী গুণ	
◉ মাফাতীহুল গায়ীব (গায়েবের চাবিকাঠি)	
◉ মু‘তাযিলাহ সম্প্রদায়ের পরিচয়	
◉ আব্দুল আযীয আল-মাক্কী এবং বিশর আল-মারীসী এর তরজমাহ	
◉ ফালাসিফাহ বা দার্শনিক সম্প্রদায়ের পরিচয়	
◉ কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের পরিচয়	
◉ মহান আল্লাহর হিকমত ও হুকুমের প্রকারভেদ	
মহান আল্লাহর রিযিকপ্রদান, ক্ষমতা ও শক্তি	
◉ মহান আল্লাহর অন্যতম একটি নাম ‘الرَّزَّاق’ (আর-রাযযাক)	
◉ ‘রিযিক’ এর প্রকারভেদ এবং এর জন্য প্রচেষ্টা চালানো	
◉ মহান আল্লাহর অন্যতম দু’টি নাম ‘الْقَوِي’ (আল-কাউয়ী) এবং ‘الْمَتِينُ’ (আল-মাতীন)	
◉ কুদরাত (ক্ষমতা) ও কুউওয়াত (শক্তি) এবং এ দু’টির মাঝে পার্থক্য	
মহান আল্লাহর সবকিছু শোনা এবং দেখা	
◉ মহান আল্লাহর বাণী ‘কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা’ এর অর্থ	

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
◉ মহান আল্লাহর জন্য শ্রবণ ও দর্শন গুণদু'টিকে সাব্যস্তকরণ এবং তাঁর অন্যতম দু'টি নাম 'السَّمِيعُ' (আস-সামী') ও 'البَصِيرُ' (আল-বাসীর)	
◉ মহান আল্লাহর সিফাত বিষয়ক আলোচনার সময় শারীরিক অঙ্গভঙ্গি বা ইশারা করার বিধান	
◉ মহান আল্লাহর 'কান' সাব্যস্ত করার বিধান	
◉ আশ'আরী সম্প্রদায়ের পরিচয়	
◉ মাতুরীদী সম্প্রদায়ের পরিচয়	
মহান আল্লাহর ইরাদাহ (ইচ্ছা) এবং মাশীআহ (চাওয়া)	
◉ মহান আল্লাহর 'اِرَادَة' (ইরাদাহ) ও 'مَشِيئَة' (মাশীআহ) গুণদু'টি সাব্যস্তকরণ	
◉ জাগতিক ইরাদাহ এবং শরীয়তগত ইরাদাহ	
◉ মহান আল্লাহ যা পছন্দ করেন না, তা কিভাবে তিনি ঘটানোর ইচ্ছা করেন?	
◉ জাগতিক ও শরীয়তগত ইরাদার মধ্যে পার্থক্য	
মহান আল্লাহর পছন্দ ও ভালোবাসা	
◉ মহান আল্লাহর 'مَحَبَّة' (মাহাব্বাহ) সিফাত সাব্যস্তকরণ, তিনি কী ও কাকে ভালোবাসেন এর ব্যাখ্যা এবং 'إحسان' (ইহসান) ও 'إقساط' (ইকসাত্ব) এর অর্থ	
◉ 'إحسان' (ইহসান) এর ক্ষেত্রসমূহ	
◉ 'إقساط' (ইকসাত্ব) এর ক্ষেত্রসমূহ	
◉ তাওবা এর শর্তসমূহ	
◉ মহান আল্লাহকে ভালোবাসার শর্ত হচ্ছে তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণ	
◉ মহান আল্লাহর অন্যতম দু'টি নাম 'الْغَفُورُ' (আল-গফূর) এবং 'الْوَدُودُ' (আল-ওয়াদূদ)	
মহান আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা	

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
◉ ‘رَحْمَة’ (রহমাহ), ‘مغفرة’ (মাগফিরাহ) এবং ‘عِلْم’ (ইলম) সিফাত সাব্যস্তকরণ	
◉ মহান আল্লাহর অন্যতম দু’টি নাম ‘الحافظ’ (আল-হাফিয) এবং ‘الحفيظ’ (আল-হাফীয)	
মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি, ক্রোধ, অভিসম্পাত, অপছন্দ, প্রবল ক্রোধ, প্রচণ্ড ঘৃণা ও অসন্তোষ এবং প্রচণ্ড রাগ	
◉ মহান আল্লাহর ‘رِضى’ (রিদ্বা), ‘غَضَب’ (গদ্বব), ‘لَعن’ (লা‘ন), ‘كُره’ (কুরাহ), ‘سَخْط’ (সাখ্ত), ‘مَقْت’ (মাক্ত) এবং ‘أَسَف’ (আসাফ) সিফাতসমূহ সাব্যস্তকরণ	
◉ ‘وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا...’ (আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করলে...) আয়াত বিষয়ক জবাব	
◉ হত্যাকারী ব্যক্তির তাওবা করার বিধান	
◉ মহান আল্লাহর ‘أسف’ (আসাফ) সিফাতের দু’টি অর্থ	
মহান আল্লাহর আসা ও আগমন	
◉ মহান আল্লাহর ‘إِتْيَان’ (আসা) ও ‘مَجِيء’ (আগমন) সিফাত দু’টি সাব্যস্তকরণ এবং যারা এগুলো রূপক হওয়ার দাবি করে তাদের দলীলের খণ্ডন	
◉ যাহিদ আল-কাউসারী এর পরিচয়	
◉ যামাখশারী এর তরজমাহ	
◉ মহান আল্লাহর মেঘের ছায়ায় উপস্থিত হওয়ার অর্থ	
মহান আল্লাহর চেহারা	
◉ মহান আল্লাহর ‘وَجْه’ (চেহারা) সাব্যস্তকরণ এবং তা অস্বীকারকারীদের বক্তব্য খণ্ডন	
মহান আল্লাহর হাত	
◉ মহান আল্লাহর ‘يَد’ (হাত) সাব্যস্তকরণ এবং তা অস্বীকারকারীদের বক্তব্য খণ্ডন	
মহান আল্লাহর চোখ	

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
◉ মহান আল্লাহর 'عَيْن' (চোখ) সাব্যস্তকরণ এবং তা অস্বীকারকারীদের বক্তব্য খণ্ডন	
◉ মহান আল্লাহর দুই হাত এবং দুই চোখ সিফাত দু'টি যেসব শব্দরূপে বর্ণিত হয়েছে	
মহান আল্লাহর শ্রবণ, দর্শন ও পর্যবেক্ষণ	
◉ মহান আল্লাহর 'سَمْع' (শ্রবণ), 'بَصَر' (দর্শন) ও 'رؤية' (অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ) সিফাতসমূহ সাব্যস্তকরণ	
চক্রান্তকারীদের বিপক্ষে মহান আল্লাহর সুকৌশল এবং শক্ত পাকড়াও	
◉ মহান আল্লাহর 'مَكْر' (চক্রান্তের পালটা কৌশল) ও 'كَيْد' (কৌশল) সিফাত দু'টি সাব্যস্তকরণ	
মহান আল্লাহর মার্জনা, ক্ষমা, শক্তি-সম্মান, মহিমা ও মর্যাদা	
◉ মহান আল্লাহর অন্যতম একটি নাম 'العَفُوُّ' (আল-'আফুউ)	
◉ মহান আল্লাহর 'عِزَّة' ('ইজ্জাত) সিফাত সাব্যস্তকরণ	
◉ 'العزَّة' (আল-'ইজ্জাহ) এর অর্থ এবং প্রকারভেদ	
মহান আল্লাহর অসাব্যস্তজাত বা না-সূচক গুণাবলি	
◉ মহান আল্লাহর না-সূচক গুণাবলি	
◉ 'سمي' (সামিই) এর অর্থ	
◉ 'نِد' (নিদ্) এর অর্থ	
◉ 'يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ' (তারা তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহ্‌র ভালোবাসার মতই) এর অর্থ	
◉ জড়বস্তুর তাসবীহ করার ধরন	
◉ 'تبارك' (তাবারাকা) এর অর্থ	
◉ 'تمانع' (তামানু') তথা এমন দু'টি বিষয় থাকা যার একটি অপরটিকে নাকচ করে দেয় এ সংক্রান্ত দলীল স্পষ্টকরণ	
◉ মহান আল্লাহর ব্যাপারে না জেনে কিছু বলা	

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
মহান আল্লাহর আরশের ওপর উঠা	
◉ আরশের ওপর ওঠা বিষয়ক ৭টি আয়াত এবং এ বিষয়ক বক্তব্য	
◉ 'ইস্তিওয়া' এর অর্থ	
◉ ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) এর বক্তব্য 'اِلإسْتِوَاءُ معلومٌ، والكيفُ مجهول'	
◉ 'استواء' (ওপরে ওঠা) এর অর্থ 'استيلاء' (কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা) করা এবং এর খণ্ডন	
◉ বাতিলপন্থীদের যুক্তির খণ্ডন যে, মহান আল্লাহর আরশের ওপর উঠা সাব্যস্ত করা হলে এটা তাঁর শরীরবিশিষ্ট হওয়া, সীমাবদ্ধ হওয়া, আরশের মুখাপেক্ষী হওয়া, দিক দ্বারা সীমাবদ্ধ হওয়া, আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বে সর্বোচ্চতায় না থাকা ইত্যাদি আবশ্যক হয়ে যায়	
◉ মহান আল্লাহর জন্য স্থান সাব্যস্ত করার বিধান	
মহান আল্লাহর সবকিছুর উপরে থাকা এবং এর প্রকারভেদ	
◉ মহান আল্লাহ যে সবকিছুর উপরে তা সাব্যস্তকরণ	
◉ মহান আল্লাহ যে আসমানে রয়েছেন তা সাব্যস্তকরণ	
◉ 'علو' (উলু) এবং এর প্রকারভেদ	
◉ মহান আল্লাহর আসমানে (في السماء) থাকার অর্থ	
মহান আল্লাহর 'সাথে থাকা' সিফাত এবং সাথে থাকা ও সর্বোচ্চতায় থাকার মাঝে সমন্বয়সাধন	
◉ মহান আল্লাহর 'معيَّة' (সঙ্গ বা সাথে থাকা) সিফাত সাব্যস্তকরণ	
◉ 'معيَّة' (সঙ্গ বা সাথে থাকা) এর প্রকারভেদ	
◉ মহান আল্লাহর সাথে থাকা ও সর্বোচ্চতায় থাকার মাঝে সমন্বয়সাধন	
◉ 'معيَّة' (সঙ্গ বা সাথে থাকা) দ্বারা কি মিশে যাওয়া এবং কোনো স্থানে থাকা আবশ্যক হয়?	
মহান আল্লাহর কালাম বা কথার বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ্র বক্তব্য	

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
◉ মহান আল্লাহর ‘كَلَام’ (কথা) সিফাত সাব্যস্তকরণ এবং এর বিরোধিতাকারীদের বক্তব্য খণ্ডন	
◉ ‘الكُلَّابِيَّة’ (কুল্লাবিয়্যাহ) সম্প্রদায়ের পরিচয়	
◉ ‘الكرَّامية’ (কার্‌রামিয়্যাহ) সম্প্রদায়ের পরিচয়	
◉ মহান আল্লাহর কালাম বা কথার বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ্‌র বক্তব্য	
কুরআন মাজীদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর বক্তব্য	
◉ কুরআন মাজীদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের মতাদর্শের সারসংক্ষেপ	
◉ যারা কুরআনকে সৃষ্ট বলে, তাদের বক্তব্য খণ্ডন	
◉ কুরআন মহান আল্লাহর কালাম বা কথা	
বান্দা কর্তৃক তাদের বরকতময় সুমহান রবকে দেখা	
◉ কিয়ামতের দিন মুমিনগণ কর্তৃক তাদের রবকে দর্শন এবং তা অস্বীকারকারীদের বক্তব্য খণ্ডন	
◉ জান্নাতীরা সুসজ্জিত আসনে বসে যেসব জিনিসের দিকে তাকিয়ে থাকবে	
◉ মহান আল্লাহর সিফাত বিষয়ক আয়াত সম্পর্কে কিছু সাধারণ আলোচনা	
সুন্নাহর পরিচয় এবং সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়ের ওপর ঈমান আনা	
◉ সিফাতের ক্ষেত্রে সুন্নাহ কুরআনকে সমর্থন করে	
◉ সুন্নাহ শরীয়তের দ্বিতীয় মৌলিক ভিত্তি	
◉ বিদ‘আতী ও প্রবৃত্তির অনুসারী সম্প্রদায় যারা সহীহ সুন্নাহ্‌র বিপক্ষে অবস্থান নেয়, তারা দু’ভাগে বিভক্ত	
মহান আল্লাহর দুনিয়ার আসমানে অবতরণ	
◉ মহান আল্লাহর ‘نُزُول’ (অবতরণ) সিফাত সাব্যস্তকরণ	
◉ ‘نُزُول’ (অবতরণ) সিফাতকে অস্বীকার ও অপব্যাখ্যাকারীদের বক্তব্য খণ্ডন	

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
◉ মহান আল্লাহ অবতরণ করলে কি তাঁর আরশ খালি হয়?	
মহান আল্লাহর আনন্দ এবং হাসি	
◉ মহান আল্লাহর 'فَرَح' (খুশি বা আনন্দ) সিফাত সাব্যস্তকরণ এবং তা অস্বীকার ও অপব্যাখ্যাকারীদের বক্তব্য খণ্ডন	
◉ মহান আল্লাহর 'ضَحِك' (হাসি) সিফাত সাব্যস্তকরণ এবং তা অস্বীকার ও অপব্যাখ্যাকারীদের বক্তব্য খণ্ডন	
মহান আল্লাহর আশ্চর্য বা বিস্ময়বোধ	
◉ মহান আল্লাহর 'عَجَب' (আশ্চর্য বা বিস্ময়বোধ) সিফাত সাব্যস্তকরণ এবং তা অস্বীকার ও অপব্যাখ্যাকারীদের বক্তব্য খণ্ডন	
মহান আল্লাহর পা ও কদম	
◉ মহান আল্লাহর 'رِجْل' (পা) ও 'قَدَم' (কদম) সিফাত সাব্যস্তকরণ এবং তা অস্বীকার ও অপব্যাখ্যাকারীদের বক্তব্য খণ্ডন	
মহান আল্লাহর সশব্দে সম্বোধন ও কথা বলা	
◉ মহান আল্লাহর 'نِدَاء' (সশব্দে ডাক বা সম্বোধন) সিফাত সাব্যস্তকরণ	
◉ মহান আল্লাহর কালাম বা কথার ব্যাপারে জাহ্‌মিয়্যাহ, আশ'আরী এবং কুল্লাবিয়্যাহ সম্প্রদায়ের মতাদর্শ	
মহান আল্লাহর সবকিছুর উপরে থাকা	
◉ মহান আল্লাহর 'علو' (ঊর্ধ্বাবস্থান) ও 'فوقية' (ঊর্ধ্বতা) সাব্যস্তকরণ	
◉ 'আরশ হচ্ছে পানির ওপরে, আর মহান আল্লাহ হলেন আরশের ওপরে' হাদীস বিষয়ে	
◉ দাসী মেয়েটির হাদীস এবং মহান আল্লাহর আসমানে থাকা বিষয়ে	
মহান আল্লাহর সাথে থাকা এবং নিকটে থাকা	
◉ মহান আল্লাহর 'معية' (সঙ্গ বা সাথে থাকা) সিফাত সাব্যস্তকরণ	
◉ নাফ্‌স (আত্মা) এর প্রকারভেদ	
◉ মহান আল্লাহ সালাত আদায়রত ব্যক্তির সামনে থাকেন	

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
◉ মহান আল্লাহর 'قرب' (নিকটবর্তিতা)	
কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দাগণ কর্তৃক তাদের রবকে দেখা	
◉ কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দাগণ কর্তৃক তাদের রবকে দেখা	
◉ মহান আল্লাহকে জান্নাতে দেখার বিষয়কে অস্বীকারকারীর বিধান	
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মধ্যবর্তিতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা	
◉ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ সকল দলের মাঝে মধ্যপন্থী ও ন্যায়নিষ্ঠ একটি দল	
◉ 'وَسَطًا' (ওয়াসাত্বা) এর অর্থ	
◉ এই উম্মতের ফিরকাহসমূহ	
পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এই উম্মতের ফিরকাহসমূহের মাঝে সঠিকপন্থী	
◉ الجهميَّة (জাহমিয়্যাহ) সম্প্রদায়ের পরিচয়	
◉ المشبِّهة (মুশাব্বিহাহ) সম্প্রদায়ের পরিচয়	
◉ الجبريَّة (জাবরিয়্যাহ) সম্প্রদায়ের পরিচয়	
◉ المرجئة (মুরজিআহ) সম্প্রদায়ের পরিচয়	
◉ الوعيدية (ও'য়ীদিয়্যাহ) সম্প্রদায়ের পরিচয়	
◉ الحرورية (হারূরিয়্যাহ) সম্প্রদায়ের পরিচয়	
◉ الرَّافضة (রাফেযী) সম্প্রদায়ের পরিচয়	
◉ الخوارج (খারেজী) সম্প্রদায়ের পরিচয়	
◉ বান্দার কর্মসমূহ এবং এ বিষয়ে হকপন্থী সম্প্রদায়ের মাযহাব	
◉ 'ইরজা' এর অর্থ	
◉ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ঈমানের নাম বা পরিচয়সমূহের ক্ষেত্রে সকল দলের মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে	

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
◉ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবীদের বিষয়ে সকল দলের মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে	
◉ জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলাহ, খারেজী এবং রাফেযী সম্প্রদায়ের মতাদর্শ	
মহান আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টির উপরে থাকাটা তাদের সাথে থাকার বিরোধী নয়	
◉ মহান আল্লাহর সবচেয়ে উঁচুতে থাকা যে তাঁর সৃষ্টির সাথে থাকার বিরোধী নয়, এর ব্যাখ্যা	
◉ الحلولية (হুলূলিয়্যাহ) সম্প্রদায়ের পরিচয়	
মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সাথে থাকা	
◉ মহান আল্লাহর 'قرب' (নৈকট্য) এবং 'معية' (সঙ্গ বা সাথে থাকা) সাবস্তকরণ	
কুরআনের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর আকীদাহ	
◉ কুরআন মহান আল্লাহর (প্রকৃত) কথা, তাঁর কথার কোনো কাহিনী-বিবরণ নয়	
◉ 'উচ্চারিত কুরআন মাখলূক (সৃষ্ট)' বলার বিধান	
বান্দা কর্তৃক তাদের রবকে (জান্নাতে ও হাশরের মাঠে) দেখার বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকীদাহ	
◉ কিয়ামতের দিন অবস্থানকারীগণ কর্তৃক তাদের রবকে দর্শন	
◉ কাফির এবং মুনাফিকরা কি কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহকে দেখতে পাবে?	
পরকালীন বিষয়সমূহ যেমন: কবরের ফিতনাহ, এর আযাব ও আরাম-আয়েশের ওপর ঈমান	
◉ মৃত্যুর পর যা কিছু ঘটবে সেসব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা কিছু জানিয়েছেন সেসবের ওপর ঈমান রাখা ফরয	
◉ কবরের ফিতনাহ (পরীক্ষা) ও এর আযাবের ওপর ঈমান রাখার আবশ্যকতা	

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
◉ কবরের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে যারা রেহাই পাবে	
◉ কবরে প্রশ্নকারী ফেরেশতা বিষয়ক বক্তব্য	
◉ কবরের আরাম-আয়েশ এবং আযাব বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ্‌র বক্তব্য	
◉ মুমিনদের কবর প্রশস্ত হওয়া এবং কাফিরদের কবর সংকীর্ণ হওয়ার যে বিষয়টি ইসলামী শরীয়তে সাব্যস্ত রয়েছে, অথচ কবরকে উন্মুক্ত করা হলে একে এর স্বাভাবিক অবস্থাতেই পাওয়া যায়— এ বিষয়ক সংশয়ের জবাব	
কিয়ামতের দিনের ঘটনাসমূহের ওপর ঈমান	
◉ শিঙ্গায় ফুঁৎকারের ওপর ঈমান রাখার আবশ্যকতা	
◉ যাকে হিংস্র জন্তু খেয়ে ফেলেছে এবং তা পুষ্টিতে রূপান্তরিত হয়ে এর রক্ত, হাড় ও গোশতের সাথে মিশে প্রস্রাব-পায়খানা হয়ে বেরিয়ে গেছে, সে কিভাবে সেদিন উঠবে?	
◉ হাশরের ওপর ঈমান রাখার আবশ্যকতা	
◉ সূর্য মাথার এতো নিকটে থাকলেও তারা কিভাবে টিকে থাকবে— এ বিষয়ক সংশয়ের জবাব	
◉ মানুষের ঘাম তাদের আমল অনুযায়ী পায়ের গিঠ, হাঁটু, স্তন এবং গলা পর্যন্ত পৌঁছাবে, অথচ তারা একই স্থানে থাকবে, এটা কিভাবে?	
◉ মহান আল্লাহর ছায়া দ্বারা যা উদ্দেশ্য	
◉ মীযানের ওপর ঈমান রাখার আবশ্যকতা এবং মুতা'যিলাহ সম্প্রদায়ের বক্তব্যের খণ্ডন	
◉ মীযানে যা যা ওজন করা হবে	
◉ আমলসমূহের পুস্তিকাতে যেসব আমলের বিষয়ে লেখা থাকবে	
◉ হিসাব-নিকাশ ও তা উপস্থাপনার ওপর ঈমান রাখার আবশ্যকতা	
◉ চতুষ্পদ প্রাণীদেরও কি হিসেব নেওয়া হবে?	
◉ হাউয (জলাধার) ও সিরাত (পুলসিরাত) এর ওপর ঈমান রাখার আবশ্যকতা	

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
◉ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ৩টি শাফা'আত থাকা এবং সাহাবীগণ কর্তৃক সেগুলোর ব্যাখ্যা	
মহান আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের ওপর ঈমানের স্তরদ্বয় এবং প্রথম স্তরের আলোচনা	
◉ তাকদীরের ভাল-মন্দের ওপর ঈমানের স্তরসমূহ এবং এদের ব্যাখ্যা	
◉ আরশ ও কলম, কোনটি সর্বপ্রথম সৃষ্টি	
◉ মা'বাদ আল-জুহানী এবং গাইলান আদ-দিমাশকী এর ব্যাখ্যা	
◉ ফয়সালা ও তাকদীরের অর্থ	
◉ এটা কিভাবে বলা যেতে পারে যে, মহান আল্লাহর তাকদীরে (পূর্বনির্ধারণে) মন্দ বিষয় রয়েছে, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, তাঁর দিকে মন্দ বিষয় আরোপিত হয় না?	
তাকদীরের ওপর ঈমানের দ্বিতীয় স্তরের আলোচনা	
◉ মহান আল্লাহ কি তাঁর সত্তার উপর ক্ষমতাবান নন?	
◉ তাকদীরসহ বান্দার কর্মসমূহ কিভাবে ঘটে এই মাসআলায় একটি উত্তম পর্যালোচনা	
◉ মহান আল্লাহ যা পছন্দ করেন না, তা কিভাবে তিনি ঘটানোর ইচ্ছা করেন?	
◉ তাকদীর ও বান্দার কর্মসমূহের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শের সারকথা	
◉ জনৈক দাঈর তাকদীর বিষয়ক বিভ্রান্তিকর টীকার জবাব	
◉ তাকদীরের ব্যাপারে দু'টি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়: কাদারিয়্যাহ এবং জাব্‌রিয়্যাহ	
◉ পূর্বনির্ধারিত ফয়সালার ওপর নির্ভর করা এবং আমল ছেড়ে দেওয়ার বিধান	
◉ যারা এই উম্মাতের মাজূস বা অগ্নিপূজক	

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
◉ জাব্‌রিয়্যাহ সম্প্রদায় মহান আল্লাহর আহকাম (বিধানাবলি) থেকে সেসবের হিকমাহ (প্রজ্ঞা) ও কল্যাণকর বিষয়কে বের করে দেয়, এটা তাহলে কিভাবে?	
ঈমানের পরিচয় এবং এর হ্রাস-বৃদ্ধি	
◉ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্যতম একটি উসূল হলো— ঈমান হচ্ছে কথা ও কাজের নাম, যা বাড়ে-কমে	
◉ 'ইরজা' আকীদাতে যেসব বিষয় রয়েছে	
কবীরাহ গুনাহগার ব্যক্তির বিধান এবং এ বিষয়ে বিপথগামী দলসমূহ	
◉ খারেজীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য	
◉ ঈমান ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য	
◉ 'كبيرة' (কাবীরাহ) বা বড় গুনাহ	
◉ কবীরাহ গুনাহগার ব্যক্তির বিষয়ে যারা আহলুস সুন্নাহ্‌র বিরোধিতা করেছে	
◉ ফাসিক ব্যক্তি কি ঈমানী পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে?	
সাহাবীদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান	
◉ সকল সাহাবীর ক্ষেত্রেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর ও জিহবা (মন্দ ধারণা ও কথা থেকে) নিরাপদ থাকে	
◉ সাহাবীদেরকে গালমন্দ করার বিধান	
সাহাবীদের মর্যাদাগত স্তরভেদ	
◉ সাহাবীদের মাঝে অগ্রাধিকার প্রদান	
◉ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীগণ	
◉ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ	
◉ 'বাই'আতুর রিদওয়ান' (সন্তুষ্টির বাই'আত) এ অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ	
◉ (কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে) জান্নাত ও জাহান্নামের সাক্ষ্যপ্রদান	
খিলাফতের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা	

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
◉ চার খলীফাহ এবং তাদের খিলাফত যেভাবে সাব্যস্ত হয়েছে	
নবীপরিবারের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকীদাহ	
◉ আহলুস সুন্নাহ নবীপরিবারকে ভালোবাসেন এবং তাদের সাথে শত্রুতা পোষণকারীদের থেকে তারা সম্পর্কমুক্ত থাকেন	
◉ 'গাদীর খুম' এর খুৎবাহ	
◉ যারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিবার-পরিজন	
◉ আহলে বাইতের বিষয়ে পথভ্রষ্ট দুই সম্প্রদায়	
নবীপত্নীগণের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান	
◉ আহলুস সুন্নাহ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্ত্রীগণকে পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন, যারা হলেন মুমিনদের মা	
◉ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্ত্রীগণ	
◉ খাদীজাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এবং আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর মর্যাদাগত ভিন্নতা সম্পর্কিত আলোচনা	
◉ খাদীজাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অনন্য বৈশিষ্ট্য	
◉ আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর অনন্য বৈশিষ্ট্য	
সাহাবীদের মাঝে সঙ্ঘটিত মতপার্থক্য ও বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান	
◉ আহলুস সুন্নাহ সাহাবীদের মাঝে সঙ্ঘটিত বিবাদ-বিসম্বাদের বিষয়ে ঘাটাঘাটি করা থেকে বিরত থাকেন	
◉ সাহাবীদের (দোষ-ত্রুটির) বিষয়ে বর্ণিত 'আসার' বা বর্ণনার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান	
◉ সাহাবীগণের নির্ভুলতা ও নিষ্পাপতা	
ওলীদের কারামত বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য	
◉ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্যতম একটি মূলনীতি হলো ওলীদের কারামতকে সত্যায়ন করা	
◉ 'ওলী' এর পরিচয়	

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
◉ কারামত ও মু'জিযাহ এর মধ্যে পার্থক্য	
◉ 'فلاسفة' (ফালাসিফাহ) বা দার্শনিক সম্প্রদায়ের পরিচয়	
◉ কারামতের মাঝে যেসব উপকারী বিষয় রয়েছে	
◉ কারামতের প্রকারভেদ	
আচার-ব্যবহার ও আমলের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর তরীকাহ	
◉ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্যতম একটি তরীকাহ হলো— প্রকাশ্যে ও গোপনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পদাঙ্ক বা রেখে যাওয়া সুন্নাহ অনুসরণ করা	
◉ সকল দীনী মৌলিক ও শাখাগত বিধিবিধান উদঘাটন করার আহলুস সুন্নাহর মানহাজ (কর্মপদ্ধতি) যে তিন মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত	
◉ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রেখে যাওয়া সুন্নাহ তিন বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত	
◉ ইজমা'র কি অস্তিত্ব রয়েছে নাকি নেই?	
◉ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ সৎ কাজের আদেশ দেন, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন এবং বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ করেন	
◉ সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধের শর্তসমূহ	
◉ মহান আল্লাহর তিক্ত বা মন্দ ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা বিষয়ক আলোচনা	
◉ শাসককে গোপনে নাসীহা করা, তাদের গীবত না করা (তাদের অনুপস্থিতিতে সাধারণ জনগণের মাঝে মৌখিক ও লিখিতভাবে তাদের দোষ-ত্রুটি তুলে না ধরা ও প্রচার-প্রসার না করা), সার্বিক কল্যাণ থাকা সাপেক্ষে শাসকের সম্মান বজায় রেখে তাদের উপস্থিতিতে ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া ও অন্যায় কাজের বিরোধিতা করা ইত্যাদি বিষয়ে ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ'র অসংখ্য ফাতাওয়ার মাঝে উল্লেখযোগ্য কিছু ফাতাওয়া	
◉ শাসক বদকার হলেও তাদের সাথে হজ্জ, জিহাদ, জুমু'আহ এবং ঈদ পালন সংক্রান্ত আলোচনা	

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
◉ আরব ও মুসলিম বিশ্বের শাসকগণ কর্তৃক মহান আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো সংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করার ক্ষেত্রে তাদেরকে তাকফীর করা (কাফির আখ্যা দেওয়া), হুজ্জাত কায়েম করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বিষয়ে ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ'র ফাতাওয়া	
◉ শাসকগণ যেসব বিষয়ের আদেশ দেন সেগুলোর সবই কি মানা ওয়াজিব?	
◉ শাসকদের সাথে মুয়ামালাতের (পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেনের) ক্ষেত্রে সালাফদের মানহাজের বিপরীত হওয়ার বিধান	
কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী দল এবং যারা এর অন্তর্ভুক্ত	
◉ সিদ্দীক, শহীদ, সালিহ ও আবদাল ব্যক্তিবর্গ	
◉ কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত 'ত্বায়েফাহ মানসূরাহ' (সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী দল) এবং কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়া বলতে যা বুঝায়	

প্রকাশকের আভাষ

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যার অপার দয়া, অনুগ্রহ ও তাউফীকে যাবতীয় ভালোকাজ সম্পন্ন হয়। অগণিত সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর, যিনি আমাদের জন্য সঠিক ইসলামী আকীদা ও মানহাজকে রেখে যাওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বাতিল ও বিপথগামী মতাদর্শ সম্পর্কেও সতর্ক করে গিয়েছেন, এ বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা রাখেননি।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রেখে যাওয়া সঠিক ইসলামকে আমাদের ন্যায়নিষ্ঠ সালাফগণ (সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণ) যুগে যুগে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেছেন এবং এতে যাতে বাতিলের অনুপ্রবেশ না ঘটে, সে বিষয়ে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করেছেন। আর তারা এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যারা কিয়ামত পর্যন্ত এই আকীদা ও মানহাজের উপর টিকে থাকবে, তারাই হলেন ত্বায়েফাহ মানসূরাহ (সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী দল) এবং ফিরকাতুন নাজিয়াহ (মুক্তিপ্রাপ্ত দল) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ। মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর দীনকে তাদের মাধ্যমেই হিফাযত করবেন।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ন্যায়নিষ্ঠ আকীদা ও মানহাজ বিষয়ে সালাফদের যুগ থেকে নিয়ে আজ অবধি অগণিত মূল্যবান কিতাবাদি রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র কালজয়ী গ্রন্থ 'আল-আকীদাতুল ওয়াসেত্বিয়্যাহ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও এর প্রতিটি কথার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অত্যন্ত ব্যাপক। অনেক আলেমে দীন এই কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে মিশরের প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান শাইখ ড. মুহাম্মাদ খলীল হাররাস (রাহিমাহুল্লাহ) এবং জগতবিখ্যাত ফকীহ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ দু'টি সমগ্র বিশ্বের আলেম-উলামা এবং ত্বালিবুল ইলমদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

আমাদের আলোচ্য 'শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসেত্বিয়্যাহ' কিতাবটিতে বিপুল জ্ঞানের সমাহার ঘটানো হয়েছে। এতে বিখ্যাত দু'টি ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছাড়াও শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ'র বিভিন্ন কিতাব যেমন: 'তা'লীকাতুশ শাইখ ইবনি উসাইমীন আলা শারহিল ওয়াসেত্বিয়্যাহ লিল হাররাস', 'শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসেত্বিয়্যাহ' (বড় ব্যাখ্যা), 'লিকাউল বাবিল মাফতূহ', 'মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল', 'ফাতহু রব্বিল বারিয়্যাহ বি তালখীসিল হামাউইয়্যাহ', 'ফাতহু যিল জালালি ওয়াল ইকরাম বি শারহি বুলূগিল মারাম', 'শারহু রিয়াদ্বিস সালিহীন' ইত্যাদি থেকে অসংখ্য মূল্যবান টীকা যুক্ত করা হয়েছে, যা এই কিতাবের কোনো অংশ সুস্পষ্টভাবে বোঝার ক্ষেত্রে পাঠকসমাজের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।

গুরুত্বপূর্ণ এই কিতাবের অপূর্ব সংকলন ও প্রাঞ্জল অনুবাদের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন উস্তায আবূ নাবীহা নাজমুস সাকিব (হাফিযাহুল্লাহ)। আর এই সুবিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থ সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন শাইখুল আকীদাহ প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া (হাফিযাহুল্লাহ)। তার সংযোজিত মূল্যবান টীকাসমূহ পাঠকসমাজকে সঠিক আকীদা বোঝার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

এতো বড়ো মাপের একটি কাজে মানবীয় ভুল-ত্রুটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যে কোনো উল্লেখযোগ্য ভুল আমাদেরকে অবহিত করলে সন্তুষ্টচিত্তে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, এমন মহামূল্যবান একটি কিতাব প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের 'দারুল হিদায়াহ পাবলিকেশন্স' এর অগ্রযাত্রা শুরু করতে পেরে আমি মহান আল্লাহর দরবারে অজস্র শুকরিয়া আদায় করছি। আর মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করছি, তিনি যেন আমাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করেন, আমাদের আমলকে সংশোধন করেন, যাবতীয় ভালোকাজ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করার তাউফীক দান করেন এবং এই কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি যেন দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দান করেন। আমীন!

অনুবাদকের ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওপর। মহান আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, কেউ তাকে হিদায়াত দিতে পারে না। অতঃপর...

মুসলিম জীবনের জন্য সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদাহ। একজন মুসলিম ব্যক্তি তার অন্তর, কথা ও কাজের মাধ্যমে সারাজীবন যত ভালো আমলই করুন না কেন, যদি তিনি বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদার অধিকারী না হন তাহলে তার যাবতীয় আমল বাতিল হিসেবে গণ্য হবে এবং তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওহীভিত্তিক যেসব ধর্মীয় বিশ্বাস তার সাহাবীগণকে শিখিয়ে গেছেন, তার মৃত্যুর পর সাহাবীদের যুগ থেকে নিয়ে আজ-অবধি প্রতিটি যুগেই একদল চরমপন্থী, স্বার্থান্বেষী ও খেয়াল-খুশির অনুসারী ব্যক্তি তা বিকৃতিসাধনের চেষ্টা চালিয়েছে এবং পথভ্রষ্টতার দ্বার উন্মোচিত করেছে। আর এক্ষেত্রে যারাই তাদের পথের অনুসারী হয়েছে তারাই পথভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিপতিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রেখে যাওয়া হিদায়াত বা পথনির্দেশকে সালাফদের (সাহাবী, তাবে'ঈ, তাবে-তাবে'ঈ) বুঝ অনুযায়ী যুগে যুগে আঁকড়ে ধরেছেন এবং এতে বাতিল মতাদর্শ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করেছেন, তারাই হলেন ন্যায়নিষ্ঠ ও মধ্যমপন্থী আকীদার পতাকাবাহী 'ত্বায়েফাহ মানসূরাহ' (সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী দল) এবং 'ফিরকাতুন নাজিয়াহ' (মুক্তিপ্রাপ্ত দল) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ। মহান আল্লাহ তাদের মাধ্যমেই তাঁর দীনকে কিয়ামত পর্যন্ত হিফাযত করবেন।

'আল-আকীদাতুল ওয়াসেত্বিয়্যাহ' কিতাবটি ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম

একজন মুজতাহিদ (গবেষক আলেম) ও মুজাদ্দিদ (ইসলামী সংস্কারক) শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র এক অনবদ্য রচনা। আলোচ্য কিতাবে তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ন্যায়নিষ্ঠ আকীদার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে মহান আল্লাহর পরিচয়, তাঁর নান্দনিক নাম ও গুণাবলি, তাঁর কর্মাবলি এবং এ বিষয়ক মূলনীতিসমূহ তিনি ওহীর আলোকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়া বিভিন্ন বাতিল কর্মপদ্ধতির ভিড়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সঠিক মানহাজ (কর্মপন্থা) কেমন হবে, তার সারকথা-সংবলিত নীতিমালা এতে চমৎকারভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। বইটি যদিও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এর প্রতিটি কথার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অত্যন্ত ব্যাপক। বাঙালি পাঠক সমাজে কিতাবটির ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইতঃপূর্বে অনূদিত হলেও তাতে কিছু বিষয়ে বিতর্কিত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছিল বিধায় এর একটি মানসম্মত ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা বহুদিন যাবত পরিলক্ষিত হচ্ছিল। অবশেষে একজন দীনী ভাইয়ের অনুপ্রেরণা ও পরামর্শে এর একটি মানসম্মত গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাঠকসমাজের কাছে তুলে দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং আল্লাহর রহমতে কাজটি পরিসমাপ্ত করি, ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।

অনেক আলেমে দীন এই কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে মিশরের প্রখ্যাত সালাফী আলেম শাইখ ড. মুহাম্মাদ খলীল হাররাস রাহিমাহুল্লাহ'র ব্যাখ্যাগ্রন্থটি আরববিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। এছাড়া সাঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম এবং জগতবিখ্যাত ফকীহ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ'র সুবিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থটির কথা না বললেই নয়। তবে সুবিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে ফায়দা অর্জন করা সবার জন্য সম্ভব হয়না বিধায় **'মুযাক্কিরাহ আলাল আকীদাতিল ওয়াসেত্বিয়্যাহ'** নামে এর একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও প্রণয়ন করা হয়েছে। এজন্য আলোচ্য 'শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসেত্বিয়্যাহ' কিতাবটিকে আমরা যেভাবে সাজিয়েছি— প্রথমে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র 'আল-আকীদাতুল ওয়াসেত্বিয়্যাহ' কিতাবের মূলভাষ্য, এরপর শাইখ মুহাম্মাদ খলীল হাররাস রাহিমাহুল্লাহ'র ব্যাখ্যা এবং এরপর শাইখ ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ'র সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। এছাড়া শাইখ মুহাম্মাদ খলীল হাররাস রাহিমাহুল্লাহ'র ব্যাখ্যার ওপর শাইখ ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ'র স্বহস্তে লিখিত টীকা-সংবলিত পুস্তিকা **'তা'লীকাতুশ শাইখ ইবনি উসাইমীন আলা শারহিল ওয়াসেত্বিয়্যাহ লিল হাররাস'** এতে সংযোজিত করা হয়েছে। তাছাড়া এই কিতাবের কোনো বক্তব্য অধিকতর সুস্পষ্টকরণের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ'র **'শারহুল আকীদাতিল ওয়াসেত্বিয়্যাহ'** এবং অন্যান্য কিতাবাদি থকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ টীকা আকারে যোগ করা হয়েছে।

এই কিতাবের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— এতে একদিকে যেমন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিশুদ্ধ আকীদাহ তুলে ধরে হয়েছে, একই সাথে আকীদার ক্ষেত্রে যেসব পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় যুগে যুগে বিস্তারলাভ করেছে তাদের বাতিল মতাদর্শের উপযুক্ত খণ্ডন করা হয়েছে, যা একজন ত্বালিবুল ইলম বা ইসলামী জ্ঞানান্বেষণকারীর জন্য জানা অপরিহার্য। কোনো ব্যক্তি এই কিতাব মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে যেসব পথভ্রষ্ট দল-উপদল সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণালাভ করতে পারবে তাদের একটি তালিকা দেওয়া হলো: (১) জাহমিয়্যাহ (২) মু'তাযিলাহ (৩) মুরজিআহ (৪) জাব্‌রিয়্যাহ (৫) কাদারিয়্যাহ (৬) আশ'আরী (৭) মাতুরীদী (৮) খারেজী (৯) রাফেযী (১০) শী'আ (১১) নাসেবী (১২) মু'আত্ত্বিলাহ (১৩) মুমাসসিলাহ ও মুশাব্বিহাহ (১৪) মুফাউয়িদাহ (১৫) মুকাইয়িফাহ (১৬) মুজাসসিমাহ (১৭) ফালাসিফাহ (১৮) আকলানিয়্যাহ (১৯) কুল্লাবিয়্যাহ (২০) কাররামিয়্যাহ (২১) ও'য়ীদিয়্যাহ (২২) হুলূলিয়্যাহ (২৩) হারূরিয়্যাহ ইত্যাদি।

পরিশেষে, অনুবাদের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। যেকোনো উল্লেখযোগ্য ভুল দৃষ্টিগোচর হলে তা অবহিত করলে সন্তুষ্টচিত্তে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। এই অধমের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তখনই সার্থক হবে যখন মহান আল্লাহ তা কবুল করবেন এবং পাঠকসমাজ তা থেকে অল্প হলেও ফায়দা অর্জন করবে। বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে মহান আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং আখিরাতে একে জান্নাত লাভের পাথেয়স্বরূপ করুন। আমীন!

আবূ নাবীহা নাজমুস সাকিব
এপ্রিল ২৫, ২০২৫ ইং

সম্পাদকের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওয়াসসালাতু ওয়াস সালামু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন ওয়া'আলা আলিহী ওয়াসাহবিহী আজমা'ঈন, ওয়াবা'দ:

আল্লাহর অশেষ রহমতেই সকল ভালো কাজ সম্পন্ন হয়। আল্লাহর দয়ায় ও তাওফীকে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-আকীদাতুল ওয়াসেত্বিয়্যাহ' এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যাদু'টি পড়তে পেরেছি।

এ গ্রন্থের লেখক সম্পর্কে পরিচয় দেয়ার দরকার আশা করি পাঠকবৃন্দের প্রয়োজন হবে না। যার ব্যাপারে তাঁর সুযোগ ছাত্র ইমাম ইবন আব্দিল হাদী আলাদা গ্রন্থ লিখেছেন। ইমাম যাহাবী আলাদা করে তার জীবনী আলোাচনা করেছেন। ইমাম ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ তার 'আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠা লিখেছেন। ইমাম যাহাবী বলেছেন, আমি যদি কা'বার রুকন ও মাকামের মাঝে দাঁড়িয়ে শপথ করে বলি যে, তার মত কাউকে আমি দেখিনি আর তিনিও তার মত কাউকে দেখেননি, তবে অবশ্যই সেটাতে শপথ ভঙ্গের কাফফারা আসবে না।

- ঈমান আকীদার জ্ঞান বললে তিনি সেটাতে পরবর্তী সবার উপরে।
- শরী'আহর জ্ঞান বললে তিনি এ ব্যাপারে প্রত্যাবর্তনস্থল।
- তাফসীরের বিষয় বললে পরবর্তী কেউ তার কাছেও ঘেষতে পারবে না।
- হাদীসের আলোচনা করলে তিনি যা বলেন সেটাই শেষ কথা হয়ে যায়, যে কারণে ইমাম যাহাবী বলেছিলেন: যে হাদীস তিনি জানেন না তা হাদীসই নয়।
- যুহদ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরবর্তী কেউ তাকে অতিক্রম করতে পারেনি।
- আদাব ও আখলাকের মধ্যে পরবর্তীদের মধ্যে তিনি সর্বশীর্ষে।
- সিয়াসাহ শার'ঈয়্যাহ বললে তিনি সেটার সঠিক পথ-প্রদর্শক।

তার সম্পর্কে ইবন আব্দিল হাদী রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক উদ্ধৃত ইবন তাইমিয়্যাহর আকীদা ও মানহাজের শত্রু শাফে'ঈদের ইমাম ইবনুয যামলেকানীর কবিতাটি সবসময় মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন:

ماذا يقول الواصفون له ... وصفاته جلت عن الحصر
هو حجة لله قاهرة ... هو بيننا أعجوبة الدهر
هو آية في الخلق ظاهرة ... أنوارها أربت على الفجر

তাঁর সম্পর্কে বর্ণনাকারীরা কী-ই বা বলবে—
তাঁর গুণাবলি তো গণনা করে বলার বাইরে!

তিনি আল্লাহর এক নিদর্শন, প্রভাবশালী ও অকাট্য—
তিনি আমাদের মাঝে যুগের এক বিস্ময়।

তিনি সৃষ্টিজগতে এক সুস্পষ্ট নিদর্শন—
যাঁর নূর ভোরের আলোককেও ছাড়িয়ে গেছে।

সুতরাং ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে আমরা জাতিকে আর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। তার ছাত্রদের মধ্যেই তিনি জীবিত আছেন। যদি দীনী বিষয়ে তার ছাত্র হওয়ার চিন্তা কেউ না করে, তবে সে সঠিক ধারায় কখনো পৌঁছতে পারবে না। তার ছাত্র হয়ে যারা ধন্য হয়েছে তাদের দিকে একবার তাকান, দেখতে পাবেন যে, আপনি আপনার দীনের ইলম এদের মাধ্যমেই কেবল অর্জন করতে পেরেছেন। তাফসীর শাস্ত্রে ইবন কাসীর, হাদীসে ইবন আব্দিল হাদী, আকীদা ও মানহাজে ইবনুল কাইয়্যেম, ইলমুর রিজালে মিযযী, ফিকহে ইবন মুফলিহ, তারিখ শাস্ত্রে যাহাবী ব্যতীত আপনি কীভাবে দীনের জ্ঞান অর্জন করবেন। তাদের অনুসারীদের মধ্যেই এসেছে ইবন রাজাব, ইবন আবিল ইয্য ও ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী। আজও জগতের কেউ সহীহ ইলম অর্জন করতে চাইলে ইবন তাইমিয়্যাহর পথে না চললে তা অর্জন করতে পারবে না।

সে ধারাবাহিকতা নিয়েই এসেছেন শাইখ ডক্টর মুহাম্মাদ খালীল হাররাস রাহিমাহুল্লাহ। তিনি আমার উস্তাদদের উস্তাদ। তাকে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এজেন্ডা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি ইবন তাইমিয়্যাহকে রদ্দ করে থিসিস লিখেন, যেন তাকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া যায়; কিন্তু তিনি ইবন তাইমিয়্যাহকে অধ্যয়ন করার পরে এর বিপরীতে গ্রন্থ লিখলেন, باعث النهضة

الإسلامية ابن تيمية السلفي। অর্থাৎ "ইসলামী জাগরণের পথিকৃত ইবন তাইমিয়্যাহ আস-সালাফী"। তিনি ইবন তাইমিয়্যাহর আকীদা ও মানহাজকে গ্রহণ করে সারাজীবন এ আকীদা ও মানহাজের সেবা করেছেন। সুতরাং তার মাধ্যমে আকীদার আকর গ্রন্থ 'আল-আকীদাহ আল-ওয়াসেত্বিয়্যাহ'র ব্যাখ্যা হবে এটাই স্বাভাবিক। আর সে ব্যাখ্যার সাথে পরবর্তী ইবন তাইমিয়্যাহ নামে যাকে আমি মনে করি, শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীনের ব্যাখ্যা ও টীকা যুক্ত হলে তা হবে সোনায় সোহাগার মত।

আমাদের তরুণ অনুবাদক, আকীদা ও মানহাজে সালাফী মানহাজের ধারক ও খাদেম 'আবূ নাবীহা নাজমুস সাকিব' ইবন তাইমিয়্যাহর গ্রন্থ 'আল-আকীদাতুল ওয়াাসেত্বিয়্যাহ'র শাইখ খালীল হাররাস রাহিমাহুল্লাহ'র ব্যাখ্যা গ্রন্থের অনুবাদ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় করেছেন। আমি সেটার অনুবাদ উপভোগ করেছি। আর তিনি এর সাথে আকীদাহ ওয়াসেত্বিয়্যাহর ওপর শাইখ ইবন উসাইমীনের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন কিতাব থেকে টীকাও যোগ করেছেন, যাতে করে একই গ্রন্থে বহু মণি-মুক্তার সমাহার করা যায়। কারণ ফার্সীতে বলে, 'হার গলে রা রং ও বুয়ে দীগার আস্ত' অর্থাৎ প্রতিটি ফুলের রং ও গন্ধ আলাদা। এর মাধ্যমে আমরা একই গ্রন্থে বহু গ্রন্থের স্বাদ পাব। আকীদা বিশুদ্ধ করার জন্য আমার উস্তাদজী শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন এর ব্যাখ্যা ও টীকা পড়লে এমন জ্ঞান আপনি পাবেন যার জন্য পূর্বযুগের মানুষদের দিনের পর দিন সফর করতে হতো।

আমি অনুবাদ ও টীকা আগা-গোড়া পড়েছি। প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছি; এ ব্যাপারে কোনো ছাড় দিইনি। গ্রন্থের কলেবর বেশি হওয়ায় আমি আমার টীকা সংযোজনে কৃপণতা করেছি। আল্লাহর কাছে রমাদ্বান মাসে সাওম রেখে দোয়া করছি, আল্লাহ যেন এ কিতাবটিকে কবুল করেন এবং এর লেখকদের জন্য, অনুবাদকের জন্য, সম্পাদকের জন্য এটিকে সাদাকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করেন। আর এর পাঠকদেরকে আকীদা ও বিশুদ্ধ মানহাজ গ্রহণ ও প্রচারের সুযোগ প্রদান করেন। আমীন। সুম্মা আমীন।

প্রফেসর ডক্টর আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
আল-ফিকহ অ্যান্ড ল' বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,
কুষ্টিয়া।

প্রারম্ভিকা
(المقدمة)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا. وأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تسليمًا مَزِيدًا

শুরু করছি মহান আল্লাহর নামে, যিনি আর-রহমান (পরম করুণাময়) এবং আর-রহীম (অতিশয় দয়ালু)। যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত এবং সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে সকল দ্বীনের উপর তিনি একে জয়যুক্ত করতে পারেন। আর সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট।

আমি মহান আল্লাহর প্রতি স্বীকৃতিজ্ঞাপন করে তাঁর তাওহীদ (একত্ববাদ) সহকারে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য মা'বূদ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল। মহান আল্লাহর অজস্র সালাত এবং সালাম বর্ষিত হোক তার ওপর, তার পরিবারবর্গ এবং সাহাবীগণের ওপর।

মুহাম্মাদ খলীল হাররাস রাহিমাহুল্লাহ'র ব্যাখ্যা

'বাস্‌মালাহ' বিষয়ক বক্তব্য এবং এ বিষয়ে বিদ্যমান মতভেদের ক্ষেত্রে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত:

আলেমগণ 'বাসমালাহ' (বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম) বিষয়ে মতভেদ করেছেন, এটি কি প্রত্যেক সূরার প্রারম্ভিক কোনো আয়াত, নাকি এটি একটি স্বতন্ত্র আয়াত যা কুরআন মাজীদের সূরাগুলোকে আলাদা করার জন্য এবং কোনো কিছুর

শুরুতে তা উল্লেখ করে বরকত হাসিলের জন্য নাযিল করা হয়েছে[৪]। এক্ষেত্রে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে ২য় মতটি।

তবে আলেমগণ এক্ষেত্রে একমত যে, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' হচ্ছে সূরা 'আন-নাম্‌ল' এর একটি আয়াতাংশ। অনুরূপভাবে তারা একমত যে, সূরা 'আত-তাওবাহ' এর শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বাক্যটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেননা এই সূরা এবং এর আগে থাকা সূরা 'আল-আনফাল' উভয়ে যেন অবিচ্ছিন্ন ধারায় বর্ণিত একটি সূরা।

'بِ' (বা): 'বিসমিল্লাহ' তে আরবী অক্ষর 'بِ' দ্বারা কোনো বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করাকে বুঝায়। আর এই 'بِ' অক্ষরটি 'হায্‌ফ' (আরবী ভাষায় কোনো শব্দ বা বাক্যের কোনো অংশ ছাটাই করা) এর সাথে সম্পর্কিত। কেউ কেউ একে ফে'ল বা ক্রিয়া হিসেবে এবং কেউ কেউ একে ইস্‌ম বা বিশেষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। দু'টি বক্তব্যই কাছাকাছি। কুরআন মাজীদে ক্রিয়া এবং বিশেষ্য উভয়টি হিসেবে এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

"পড় তোমার রবের নামে"[৫]।

তিনি আরো বলেন,

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

"আল্লাহর নামে এর গতি এবং স্থিতি"[৬]।

এটি ক্রিয়ার সাথে নাকি বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তা নির্ধারণের বিষয়টি পরে করাই ভাল। [কেননা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নামের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে। আর 'জার-মাজরূর' (Preposition এবং Preposition এর সাথে সম্পর্কযুক্ত শব্দ) কে উপস্থাপনায় অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে এটা বুঝা যাবে যে, বিশেষভাবে মহান আল্লাহর নামটি বরকত হাসিলের জন্য উল্লেখ করা

৪. শাইখ আহমাদ শাকির ইমাম তিরমিযীর 'আল-জামিউস সহীহ' গ্রন্থে (২/১৬-২৫) মাসআলাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বাক্যটি বরকত হাসিল করা ছাড়াও প্রত্যেক সূরার অন্তর্ভুক্ত একটি আয়াত।

৫. সূরা আল-'আলাক: ১

৬. সূরা হূদ: ৪১

‘حَمْد’ (হাম্‌দ): হাম্‌দ হচ্ছে, কোনো স্বেচ্ছাকৃত অনুগ্রহের জন্য মৌখিক প্রশংসা,[১৪] তা হতে পারে কোনো নিয়ামত বা অন্য কিছুর জন্য। বলা হয়ে থাকে, আমি লোকটির প্রশংসা করেছি তার দানের জন্য। আর আমি তার প্রশংসা করেছি তার সাহসিকতার জন্য।

‘شُكْر’ (শুক্‌র): আর শুক্‌র হচ্ছে, বিশেষভাবে কোনো নিয়ামত প্রাপ্তির জন্য কৃত প্রশংসা, আর তা সম্পন্ন হয় অন্তর, জিহ্বা এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে। কবি বলেন,

أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلاَثَةً...
يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيْرَ الْمُحَجَّبَا

‘আমার নিকট থেকে ৩টি নিয়ামত তোমাদেরকে ফায়েদা দিয়েছে...
আমার হাত, আমার জিহ্বা এবং লুক্কায়িত বিবেক’।

কাজেই এর ভিত্তিতে বলা যায়, ‘হাম্‌দ’ এবং ‘শুক্‌র’ একটি দৃষ্টিকোণ থেকে কখনো ‘আম’ (ব্যাপক) এবং কখনো ‘খাস’ (সুনির্দিষ্ট)। উভয়টি দ্বারা কোনো নিয়ামতের জন্য মৌখিক প্রশংসাকে বুঝায়। তবে এককভাবে ‘হাম্‌দ’ দ্বারা এমন মৌখিক প্রশংসাকে বুঝায় যাতে উপকৃত হওয়াটা উদ্দেশ্য থাকতেও পারে আবার নাও পারে।

আর এককভাবে ‘শুক্‌র’ দ্বারা এমন প্রশংসাকে বুঝায় যা অন্তর এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে হয় এবং তা হয় খাসভাবে কোনো নিয়ামত প্রাপ্তির জন্য। এটি কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, এই দৃষ্টিকোণ থেকে ‘হামদ’ হচ্ছে ‘আম’। আর কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তা হবে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ‘খাস’। অপরদিকে ‘শুক্‌র’ হচ্ছে এর বিপরীত (অর্থাৎ কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তা হবে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ‘আম’ এবং কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ‘খাস’)।

‘হাম্‌দ’ এবং ‘মাদ্‌হ’ এর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ)

১৪. সংজ্ঞায় কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। কেননা মহান আল্লাহর হাম্‌দ বা প্রশংসা হবে সৃষ্টির প্রতি তাঁর ইহসান, তাঁর স্বাধীন কার্যাবলি এবং তাঁর অপরিহার্য সত্তাগত গুণাবলির জন্য। সম্ভবত ব্যাখ্যাকার (রাহিমাহুল্লাহ) মাখলূকের সাথে সম্পৃক্ত করে ‘হামদ’ এর অর্থ নিয়েছেন। **(দেখুন ‘তা‘লীকাতুশ শাইখ ইবনি উসাইমীন আলা শারহিল ওয়াসেত্বিয়্যাহ লিল হাররাস’, পৃ: ৩)**

থেকে সকল বিষয়ে সব ধরনের প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য হবে না। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছেন তিনি যিনি সর্বপ্রকার পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী। (আর যদি কারো মাঝে কোনো একটি গুণের উপস্থিতি না থাকে, তাহলে তার প্রশংসাও এজন্য ঘাটতিপূর্ণ হবে)"[১৮]।

'রাসূল' এবং 'নবী' এর মাঝে পার্থক্য বিষয়ক বক্তব্যের তাহকীক:

আভিধানিকভাবে 'রাসূল' হচ্ছেন তিনি যিনি শরীয়তের বার্তা সহকারে প্রেরিত হয়েছেন। বলা হয়ে থাকে, সে তাকে এই এই জিনিস সহকারে পাঠিয়েছে, যদি তাকে তা পালন করা এবং পৌঁছানোর আদেশ করা হয়। এর বহুবচন হচ্ছে 'সীন' অক্ষরে জযম সহকারে 'رُسْل' (রুস্‌ল) এবং দ্বাম্মাহ (পেশ) সহকারে 'رُسُل' (রুসুল)।

আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 'রাসূল' হচ্ছেন একজন মানুষ, পুরুষ এবং স্বাধীন ব্যক্তি, যার উপর কোনো শার'ঈ ওহী নাযিল করা হয়েছে এবং যিনি তা প্রচার করার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন।

আর যদি এমন হয় যে, তার উপর শার'ঈ ওহী নাযিল করা হয়েছে কিন্তু তাকে তা প্রচার করার আদেশ করা হয়নি, তাহলে তিনি একজন নবী। এজন্য বলা যায়, প্রত্যেক রাসূলই নবী, কিন্তু বিপরীতভাবে প্রত্যেক নবী রাসূল নন[১৯]।

সম্পর্কে ইশারা করেছেন।

১৮. হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) এর বক্তব্যের পরিসমাপ্তি। দেখুন 'মাদারিজুস সালিকীন' কিতাব (১/৬৪)।

১৯. শাইখ উমর আল-আশকার তার 'আর-রুসুল ওয়ার রিসালাত' কিতাবে (পৃ: ১৪) উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য কথাটি আলেমদের মাঝে প্রসিদ্ধ তবে এটা হক থেকে দূরবর্তী। কেননা মহান আল্লাহ তাঁর বাণীতে নবীদেরকে পাঠানোর ক্ষেত্রেও উল্লেখ করেছেন:

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّ لَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ

"আর আমরা আপনার পূর্বে যে রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি, তাদের কেউ যখনই (ওহীর কিছু) তিলাওয়াত করেছে, তখনই শয়তান তাদের তিলাওয়াতে (কিছু) নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা বিদূরিত করেন"। (সূরা আল-হাজ্জ: ৫২)

আর এটা সম্ভব নয় যে, মহান আল্লাহ কেবল একজন মানুষের প্রতি ওহী নাযিল করেছেন

‘رَسُولَهُ’ (তাঁর রাসূল) অর্থাৎ মহান আল্লাহর জন্য যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে তার মুদ্বাফ (সম্বন্ধকৃত পদ) ‘রাসূল’ বলতে এখানে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্দেশ্য।

‘হুদা’ এর অর্থ এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা দ্বারা গুণান্বিত ও যা দ্বারা গুণান্বিত নন:

‘الهُدى’ **(আল-হুদা):** আভিধানিকভাবে ‘হুদা’ (হিদায়াত) হচ্ছে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে স্পষ্টকরণ এবং পথপ্রদর্শন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى

“আর সামূদ সম্প্রদায়, আমরা তাদেরকে পথনির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধপথে চলা পছন্দ করেছিল”[২০]।

এবং তিনি তা কারো নিকট তাবলীগ করেননি। এছাড়া সহীহ বুখারী এবং মুসলিমের হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

عُرِضَتْ عليَّ الأمم، فرأيتُ النبيِّ ومعه الرهط، والنبيَّ ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد

“আমাকে বিভিন্ন কওমকে দেখানো হলো। আর আমি দেখলাম কোনো একজন নবী এবং তার সাথে থাকা একদল লোক (অনুসারী), কোনো নবী এবং তার সাথে থাকা একজন বা দু’জন লোক এবং কোনো নবী এবং তার সাথে কোনো লোকই নেই...”।

নবী এবং রাসূলের মাঝে পার্থক্য বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, রাসূল হচ্ছেন তিনি যাকে নতুন শরীয়ত সম্পর্কে ওহী করা হয়েছে। আর নবী হচ্ছেন তিনি যিনি প্রেরিত হয়েছেন তার পূর্বে আগত কারো শরীয়তকে সমর্থন এবং তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী এমন ছিলেন। এটা হকের অধিক নিকটবর্তী। মহান আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। (শাইখের বক্তব্যের পরিসমাপ্তি)

নবী এবং রাসূলের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে তৃতীয় মত হচ্ছে, রাসূল হচ্ছেন তিনি যার কাছে সরাসরি জিবরীল আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়েছে, তিনি তার কাছে সরাসরি কথা বলেছেন ও মুখোমুখি হয়েছেন। আর নবী হচ্ছেন তিনি যাকে ইলহাম বা স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী প্রদান করা হয়েছে।

নবী এবং রাসূলের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে চতুর্থ মত হচ্ছে, রাসূল হচ্ছেন যিনি ঈমানদার ও কাফির উভয় কওমের কাছে প্রেরিত হয়েছেন, আর নবী হচ্ছেন তিনি যিনি শুধু ঈমানদার কওমের কাছে প্রেরিত হয়েছেন, তবে তিনি ঈমানদারদের জন্য প্রয়োজনে জিহাদও করেছেন। এটা হকের অধিক নিকটবর্তী। মহান আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। **[সম্পাদক]**

২০. সূরা ফুস্সিলাত: ১৭

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য তার রবের পরিপূর্ণ দাসত্বের স্বীকৃতিপ্রদান এবং তার রিসালাতের পরিপূর্ণতাকে সাব্যস্ত করে। আর শ্রেষ্ঠতম গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনি যে সকল মানুষকে ছাড়িয়ে গেছেন, এটি তাও শামিল করে।

এই সাক্ষ্যপ্রদান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বান্দা তিনি যেসব বিষয় আমাদেরকে জানিয়েছেন সেসব বিষয়কে সত্যায়ন না করবে, তিনি যেসব বিষয় আদেশ করেছেন সেগুলো পালন না করবে এবং যেসব বিষয় থেকে তিনি নিষেধ করেছেন সেগুলো বর্জন না করবে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওপর 'সালাত' এবং সালাতের অর্থ, যদি তা ফেরেশতা বা মানুষের ক্ষেত্রে হয়:

'صَلَاة' (সালাত): আভিধানিকভাবে 'সালাত' হচ্ছে দো'আ বা আহবান-প্রার্থনা। মহান আল্লাহ বলেন,

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

"আর আপনি তাদের জন্য দো'আ করুন। আপনার দো'আ তো তাদের জন্য প্রশান্তিকর"[৪৩]।

আর 'মহান আল্লাহ কর্তৃক তাঁর রাসূলের উপর সালাত'[৪৪] এর বিষয়ে সবচেয়ে সহীহ কথা হচ্ছে যা ইমাম বুখারী তার 'আস-সহীহ' কিতাবে আবুল 'আলিয়াহ

৪৩. সূরা আত-তাওবা: ১০৩।

৪৪. "আর যারা 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওপর মহান আল্লাহর সালাত' এর ব্যাখ্যা করে থাকেন রহমত (দয়া ও অনুগ্রহ) বর্ষণ হিসেবে, তাদের বক্তব্যটি দুর্বল। কেননা প্রত্যেকের জন্যই মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে। এজন্য যদি বলা হয় 'মহান আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে রহম করুন', এক্ষেত্রে তা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ সবাই একমত। তবে যদি বলা হয় 'মহান আল্লাহর সালাত অমুক ব্যক্তির ওপর', এক্ষেত্রে তা জায়েয হবে কিনা এ বিষয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। কাজেই এটি প্রমাণ বহন করে যে, 'সালাত' হচ্ছে 'রহমত' থেকে ভিন্ন কিছু। এছাড়া মহান আল্লাহ বলেন: 'এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের রব-এর কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ (সালাত) এবং রহমত বর্ষিত হয়' (সূরা আল-বাকারাহ: ১৫৭)। আয়াতটিতে সংযোজক অব্যয় 'এবং' থাকায় তা 'রহমত' থেকে ভিন্ন কিছু হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এজন্য 'সালাত' হচ্ছে 'রহমত' থেকে খাস বিষয়। কাজেই 'মহান আল্লাহর সালাত তাঁর রাসূলের ওপর' এর অর্থ হচ্ছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ব্যাপারে ঊর্ধ্বজগতের ফেরেশতাদের নিকট তাঁর প্রশংসা"। **(দেখুন ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ'র 'শারহুল আকীদাতিল ওয়াসেত্বিয়্যাহ', খণ্ড: ১, পৃ: ৪৬-৪৭)**

(রাহিমাহুল্লাহ) থেকে উল্লেখ করেছেন। তিনি (আবুল ‘আলিয়াহ) বলেন,

صَلَاةُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ: ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ

‘মহান আল্লাহর সালাত তাঁর রাসূলের উপর’ এর অর্থ হচ্ছে ফেরেশতাদের নিকট রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ব্যাপারে মহান আল্লাহর গুণ বর্ণনা ও প্রশংসা করা[৪৫]।

আর ‘ফেরেশতাগণ কর্তৃক নবীর ওপর সালাত পাঠ’ এর বিষয়ে প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে:

فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ أَوْ يُحْدِثْ فِيهِ

“মসজিদে প্রবেশ করার পর সেখানে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতের জন্য অবস্থান করবে ততক্ষণ তাকে সালাতের মধ্যে গণ্য করা হবে। তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত তার সালাত আদায়ের স্থানে অবস্থান করে, মালায়িকাহ (ফেরেশতাগণ) তার জন্য এই বলে দো‘আ করতে থাকে: ‘হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন। হে আল্লাহ! তার তাওবা কবুল করুন’। যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয় অথবা তার ওযু না ভাঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত মালায়িকাহ (ফেরেশতাগণ) তার জন্য এরূপ দো‘আ করতে থাকে”[৪৬]।

আর মানুষের ক্ষেত্রে ‘নবীর ওপর সালাত পাঠ’ এর অর্থ হচ্ছে, কাকুতি-মিনতি ও

৪৫. ইমাম বুখারী বর্ণনাটিকে টীকা আকারে উল্লেখ করেছেন (অধ্যায়: ‘নিশ্চয়ই মহান এবং ফেরেশতাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সালাত প্রেরণ করেন’ আয়াতের তাফসীরে, ফাতহুল বারী: ৮/৫৩২)। এছাড়া ইবনু ইসহাক আল-কাদ্বী তার কিতাব ‘ফাদ্বলুস সালাত আলান নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’ কিতাবে (পৃ: ৮২) বর্ণনাটিকে উল্লেখ করেছেন। শাইখ আলবানী বলেন: এর সানাদ মাওকূফ হাসান।

৪৬. হাদীসটি ইমাম বুখারী কর্তৃক ‘কিতাবুল আযান’ এ (অধ্যায়: ‘যে ব্যক্তি মাসজিদে বসে সলাতের অপেক্ষা করে’, ফাতহুল বারী: ২/১৪২) বর্ণিত হাদীসের একটি অংশ। এছাড়াও হাদীসটি ‘কিতাবুল মাসাজিদ’ এবং ‘কিতাবু বাদ্‌ইল খাল্‌ক’ এ বর্ণিত হয়েছে। আর ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ‘কিতাবুল মাসাজিদ’ এ (অধ্যায়: ‘জামাআতে সালাত আদায় এবং সালাতের জন্য অপেক্ষারত থাকার ফযীলত’, নাওয়াউয়ী: ৫/১৭১)। কাছাকাছি শব্দে হাদিসটি আরো বর্ণনা করেছেন ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ তার ‘আল-মুসনাদ’ কিতাবে এবং মালিক তার ‘আল-মুওয়াত্তা’ কিতাবে।

প্রার্থনা করা (যাতে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে ঊর্ধ্বজগতের ফেরেশতাদের নিকট প্রশংসা করেন)।

‘آل’ (পরিবারবর্গ): কারো পরিবারবর্গ বলতে বুঝায়, যারা আত্মীয়তা এবং অন্যান্য উপায়ে তার সাথে নিবিড় ও দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিবারবর্গ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সেসব ব্যক্তিবর্গ, যাদের উপর তার জীবদ্দশায় সাদাকাহ গ্রহণ করা হারাম ছিল। তারা ছিলেন বানূ হাশিম এবং বানূ মুত্তালিব গোত্রের লোকজন। আবার কখনো কখনো ‘আল’ দ্বারা ‘যারা দীনের ক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করেছেন তারা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত’ বলা হয়[৪৭]।

‘آل’ শব্দটির মূল হচ্ছে ‘أَهْلٌ’, যেখানে ‘হা’ অক্ষরটি ‘হামযাহ’ এর মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে। অতঃপর দু’টি হামযাহ একত্রিত হয়েছে এবং এদের মাঝে ২য় হামযাটি পরিবর্তিত হয়ে ‘আলিফ’ হয়েছে। ‘ক্ষুদ্র’ অর্থে তা ‘أُهَيل’ (উহাইল) বা ‘أُوَيْل’ (উওয়াইল) হয়ে থাকে। এটি সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান কারো ক্ষেত্র ছাড়া ব্যবহৃত হয় না। যেমন এটা বলা হবে না যে: ‘آلُ الْإِسْكَافِ’ (মুচির পরিবারবর্গ) এবং ‘آلُ الْحَجَّامِ’ (হিজামাকারীর পরিবারবর্গ)।

‘صَحْب’ (সাহ্‌ব): ‘সাহ্‌ব’ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সকল সাহাবী, যারা মুমিন অবস্থায় তার জীবদ্দশায় তার সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং এর উপর মারা গেছেন[৪৮]।

‘السَّلَامُ’ (আস-সালাম): ‘السَّلَامُ’ হচ্ছে ‘سلَّم’ এর ক্রিয়াবিশেষ্য, (سلَّم تَسْلِيمًا عَلَيْهِ) যার অর্থ হচ্ছে কারো জন্য যাবতীয় মন্দ বিষয় থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করা। এটি মহান আল্লাহর অন্যতম একটি গুণবাচক নাম যার অর্থ: যিনি যাবতীয় কমতি, ঘাটতি এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত অথবা যিনি আখিরাতে মুমিনদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করবেন।

---

৪৭. সে হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘আল’ বলতে প্রতিটি মুমিন মুসলিমকেই বুঝানো হবে। এ মতটি অনেক আলেমের নিকটই বেশি প্রাধান্যপ্রাপ্ত। **[সম্পাদক]**

৪৮. এখানে ‘মুমিন অবস্থায়’ কথাটির উদ্দেশ্য হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি ঈমান থাকাবস্থায়। কেননা সাধারণভাবে ঈমান বলতে রাসূলগণের প্রতি ঈমানকে বুঝাবে। তবে যদি একে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে শর্তযুক্ত করে দেওয়া হতো তাহলে তা অধিকতর উত্তম হতো। **(দেখুন ‘তা‘লীকাতুশ শাইখ ইবনি উসাইমীন আলা শারহিল ওয়াসেত্বিয়্যাহ লিল হাররাস’, পৃ: ৩)**

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের পরিচয়
(تعريف أهل السنة والجماعة)

أَمَّا بَعْدُ؛ فَهَذَا اعْتِقَادُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ: أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

অতঃপর বক্তব্য এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত এটি 'আল-ফিরকাতুন নাজিয়াহ আল-মানসূরাহ' বা নাজাতপ্রাপ্ত-সাহায্যপ্রাপ্ত দলের আকীদাহ, যারা হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত[৫০]।

---

৫০. শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) তার 'আল-আকীদাতুল ওয়াসেত্বিয়্যাহ' এর ব্যাখ্যায় বলেন:

"গ্রন্থকার রাহিমাহুল্লাহ'র কথা থেকে বুঝা যায়, যারা আহলুস সুন্নাহ্‌র পথ-পদ্ধতির বিরোধিতা করবে তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, আশ'আরী এবং মাতুরীদী সম্প্রদায় এই দৃষ্টিকোণ থেকে আহলুস সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তারা মহান আল্লাহর সিফাতকে সেগুলোর প্রকৃত অর্থে সাব্যস্ত করার ব্যাপারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তার সাহাবীগণ যে মত ও পথের উপর ছিলেন তার বিরোধিতা করেছে। এজন্য যারা বলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ বলতে ৩টি সম্প্রদায়কে বুঝায়: সালাফী, আশ'আরী এবং মাতুরীদী, তারা ভুলের মধ্যে আছেন। এটি সঠিক কোনো কথা নয়। আমরা বলি: সবাই কিভাবে আহলুস সুন্নাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত যেখানে তারা নিজেরাই আকীদার ক্ষেত্রে ভিন্ন মতাবলম্বী? এই সত্যের পর যা আছে তা ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়। কিভাবে তারা আহলুস সুন্নাহ হতে পারে যেখানে তাদের প্রত্যেকটি সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের মতকে খণ্ডন করছে?! এই বিরোধী পক্ষগুলোকে যদি একত্রিত না করা যায় তাহলে এটা সম্ভব নয়। আর হ্যা! এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাদের মাঝে একটি সম্প্রদায় এমন রয়েছে যারা সুন্নাহ্‌র অনুসারী। সেটি তাহলে কোনটি, আশ'আরী, মাতুরীদী নাকি সালাফী? আমরা বলবো: যাদের মতাদর্শ সুন্নাহ অনুযায়ী হবে তারাই সুন্নাহপন্থী। আর যাদের মতাদর্শ সুন্নাহ্‌র বিপরীত হবে তারা সুন্নাহপন্থী নয়। এজন্য আমরা বলি: সালাফীগণ হচ্ছেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ। তারা ব্যতীত অন্য কারো জন্য এই বৈশিষ্ট্য কখনোই প্রযোজ্য নয়। কোনো শব্দকে সাধারণত এর অর্থ অনুযায়ী বিচার করা হয়। আসুন তাহলে দেখি যারা সুন্নাহ্‌র বিরোধিতা করে তাদেরকে কিভাবে আমরা আহলুস সুন্নাহ নামকরণ করতে পারি? অসম্ভব! আর কিভাবে আমরা বলতে পারি যে, এই ৩টি ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায় একত্রিত হয়েছে? এই ইজতিমা' (একত্রিকরণ) কোথায় সংঘটিত হয়েছে? বরং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত হচ্ছে আকীদার দিক থেকে আমাদের সালাফ বা পূর্বসূরী। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত পরবর্তীদের মধ্য থেকে যারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তার সাহাবীদের পথ-পদ্ধতির উপর থাকবে তারাও সালাফী হিসেবে গণ্য হবে"। **(দেখুন ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ'র 'শারহুল আকীদাতিল**

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ
(اعتقاد أهل السنة والجماعة)

وَهُوَ الإِيمانُ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، والإِيمَانِ بِالْقَدَرِ خِيْرِهِ وَشَرِّهِ

আর তা (তাদের আকীদাহ) হলো মহান আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং তাকদীদের ভাল-মন্দের ওপর ঈমান রাখা।

মুহাম্মাদ খলীল হাররাস রাহিমাহুল্লাহ'র ব্যাখ্যা

ঈমানের ৬টি রুকন:

উল্লেখিত ৬টি বিষয় হচ্ছে ঈমানের[৫৪] রুকন। কারো ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই ৬টি বিষয়ের সবগুলোর প্রতি কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিকভাবে ঈমান না আনবে। কাজেই কেউ যদি এসবের কোনো একটিকে অস্বীকার করে কিংবা কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী এগুলোর ওপর ঈমান পোষণ না করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

---

৫৪. "আভিধানিক অর্থে ঈমান: অনেক মানুষ বলে থাকে, তা হচ্ছে বিশ্বাস। 'আমি বিশ্বাস পোষণ করি' এবং 'আমি ঈমান রাখি' এ দু'টি কথার অর্থ আভিধানিকভাবে একই। আমরা ইতঃপূর্বে কুরআনের তাফসীরে উল্লেখ করেছি যে, এই বক্তব্যটি সঠিক নয়। বরং আভিধানিকভাবে ঈমান হলো— কোনো কিছু অন্তর থেকে বিশ্বাস করে একে স্বীকৃতিপ্রদান করা বা মেনে নেওয়া। এর দলীল হলো আপনার এই কথা বলা যে, 'আমি অমুক বিষয়টি বিশ্বাস করি', 'আমি অমুক বিষয়টি স্বীকার করি', 'আমি অমুক ব্যক্তিকে বিশ্বাস করি' ইত্যাদি। কিন্তু আপনি এটা বলেন না যে, 'আমি অমুক ব্যক্তির প্রতি ঈমান রাখি'।

কাজেই ঈমান শব্দটি কেবল 'বিশ্বাস' অপেক্ষা বেশি কিছু অর্থ ধারণ করে। আর তা হলো অনুমোদন ও স্বীকৃতিজ্ঞাপন, যা কোনো খবরকে কবুল করে নেওয়া এবং কোনো বিধানের প্রতি আত্মসমর্পন করাকে অপরিহার্য গণ্য করে। এই ঈমান, যদি আপনি কেবল এই বিশ্বাস রাখেন যে, মহান আল্লাহ অস্তিত্বশীল, তাহলে এটি ঈমান নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ঈমান কোনো খবরকে কবুল করে নেওয়া এবং কোনো বিধানের প্রতি আত্মসমর্পন করাকে অপরিহার্য হিসেবে গণ্য না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা ঈমান বলে বিবেচিত হবে না"। **(দেখুন ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ'র 'শারহুল আকীদাতিল ওয়াসেত্বিয়্যাহ', খণ্ড: ১, পৃ: ৫৪-৫৫)**

মুহাম্মাদ খলীল হাররাস রাহিমাহুল্লাহ'র ব্যাখ্যা

মহান আল্লাহর সিফাতসমূহকে 'তাহরীফ' (বিকৃতিসাধন), 'তা'ত্বীল' (নিষ্ক্রীয়করণ), 'তাকয়ীফ' (ধরণ নির্ধারণ) এবং 'তামসীল' (সাদৃশ্য প্রদান) ব্যতীত সাব্যস্তকরণ:

গ্রন্থকার রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য **'মহান আল্লাহর ওপর ঈমানের মধ্যে রয়েছে.....'**। এটি হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর বিস্তারিত বক্তব্যের শুরু। 'مِنْ' শব্দটি এখানে আলাদা আলাদা অংশ উল্লেখ করার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে— আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ঈমান বিষয়ে সর্বপ্রথম মূলনীতি, যা কিনা ঈমানের সর্বশ্রেষ্ঠ মূলনীতি এবং এর ভিত্তি, এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর ওপর ঈমান। মহান আল্লাহর ওপর ঈমানের ক্ষেত্রে তারা সেভাবে তাঁর ওপর ঈমান পোষণ করেন যেভাবে তিনি আল্লাহ তাঁর নিজেকে গুণান্বিত করেছেন.....।

তাহরীফ এবং তা'ত্বীল, এদের অর্থ ও প্রকারভেদ:

তার বক্তব্য **'مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ' (তাহরীফ ব্যতীত);** কথাটি পূর্বোল্লেখিত ঈমানের সাথে সম্পর্কিত। এর অর্থ হচ্ছে— তারা মহান আল্লাহর সিফাতসমূহের প্রতি সব ধরনের বাতিল অর্থ করা থেকে বিরত থেকে ঈমান আনে, 'তামসীল (সাদৃশ্য প্রদান) ব্যতীত সাব্যস্তকরণ এবং তা'ত্বীল (নিষ্ক্রীয়করণ) ব্যতীত পবিত্রকরণ'[৭৬] নীতি অনুসারে।

মূলগতভাবে 'تَحْرِيف' শব্দটি যেখান থেকে এসেছে তা হচ্ছে: 'حرفتُ الشَّيْءَ عَنْ وَجْهِهِ حَرْفًا' (আমি বিষয়টিকে এর মূল অর্থ থেকে বিকৃত ও পরিবর্তন করেছি)। এটি এসেছে আরবী 'ضَرَبَ' বাব থেকে, যখন আপনি সেটা বিকৃত ও পরিবর্তন করেন। এখানে তাশদীদ এর ব্যবহার মূলত জোরপ্রদান এবং আতিশয্য অর্থে।

'تَحْرِيفُ الْكَلَامِ' (কথার বিকৃতি): তা হচ্ছে— কোনো কথার যে অর্থটি চিন্তা-

৭৬. আরবীতে এটাকে বলা হয়, 'ইসবাতান বিলা তামসীল ওয়া তানযীহান বিলা তা'ত্বীল'। এ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত নীতি। যার অর্থ হচ্ছে সিফাতগুলোকে সাব্যস্ত করবো তবে কারো সাথে সাদৃশ্য প্রদান করে নয়। সাব্যস্ত করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করবো না। অনুরূপভাবে আল্লাহর সিফাতগুলোকে সৃষ্টির কারো মত হওয়া ও অপূর্ণ গুণ হওয়া থেকে পবিত্র করে সাব্যস্ত করবো, তবে পবিত্র করতে গিয়ে সেগুলোকে নিষ্ক্রীয় করে ফেলবো না। **[সম্পাদক]**

ভাবনা করা ছাড়াই আমরা বুঝতে পারি তা বাদ দিয়ে এমন কোনো অর্থ করা, শব্দের যে অর্থটি কেবল সম্ভাব্য ও সন্দেহযুক্ত, যে অর্থ করতে হলে সেখানে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক কোনো কিছু থাকতে হবে; যাতে করে এটা স্পষ্ট হয় যে, এমনটাই ছিল এর উদ্দেশ্য[৭৭]।

'تَعْطِيل' (তা'ত্বীল): আর 'তা'ত্বীল' শব্দটি 'عَطَل' শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ শূন্যকরণ, খালিকরণ, পরিত্যাগকরণ, নিষ্ক্রীয়করণ ইত্যাদি। যেমন মহান আল্লাহর বাণীতে এর অর্থ এসেছে: وَ بِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ "বহু কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে"[৭৮]।

অর্থাৎ জনপদের লোকজন সেগুলোকে উপেক্ষা করেছে এবং কূপসমূহে অবতরণ করাকে বর্জন করেছে। এখানে 'তা'ত্বীল' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান আল্লাহর সিফাতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করা এবং সেগুলো যে তাঁর যাত বা সত্তার সাথে রয়েছে, তা অস্বীকার করা[৭৯]।

---

৭৭. তাহরীফ বা পরিবর্তনের বিষয়টি কোনো শব্দ বা অর্থ উভয় ক্ষেত্রে হতে পারে।

শব্দের ক্ষেত্রে তাহরীফের উদাহরণ হচ্ছে, মহান আল্লাহর বাণী: 'وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا' (আর অবশ্যই আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন) আয়াতে 'আল্লাহ' নামের শেষ অক্ষরে 'দ্বম্মাহ' (পেশ) না দিয়ে 'ফাতহা' (যবর) দেওয়া। এখানে 'দ্বম্মাহ' না দিয়ে 'ফাতহা' দিলে অর্থ হবে 'আর অবশ্যই মূসা আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন' অর্থাৎ মহান আল্লাহ যে কথা বলেন তা এখানে স্পষ্ট হলো না।

আর অর্থের ক্ষেত্রে তাহরীফের উদাহরণ হচ্ছে, মহান আল্লাহর বাণী: 'اسْتَوَى' (উপরে উঠা) এর অর্থ 'استولى' (কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা) করা এবং 'يده' (তাঁর হাত) এর অর্থ 'قدرته' (তাঁর ক্ষমতা) করা ইত্যাদি।

৭৮. মহান আল্লাহর বাণী:

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَ بِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّ قَصْرٍ مَّشِيْدٍ

"অতঃপর আমরা বহু জনপদ ধ্বংস করেছি যেগুলোর বাসিন্দা ছিল যালেম। ফলে এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে বহু কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং অনেক সুদৃঢ় প্রাসাদও!" (সূরা আল-হাজ্জ: ৪৫)।

৭৯. তা'ত্বীল (অর্থশূন্য ও বাতিলকরণ) দুই প্রকার। যথা:

◉ **পুরোপুরি:** যেমন জাহমিয়্যাহ এবং মু'তাযিলাহ সম্প্রদায় যেভাবে মহান আল্লাহর সিফাতসমূহকে অস্বীকার করে।

◉ **আংশিক:** যেমন আশ'আরী সম্প্রদায় কেবল ৭টি সিফাতকে স্বীকার করে এবং বাকিগুলোকে অস্বীকার করে।

তাহরীফ এবং তা'ত্বীল এর মধ্যে পার্থক্য: তা'ত্বীল হচ্ছে কোনো কিছুর সঠিক অর্থ যা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, তা অস্বীকার করা। আর তাহরীফ হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ্‌র মূল বক্তব্যকে বাতিল অর্থে ব্যাখ্যা করা, যার কোনো দলীল কুরআন-সুন্নাহ তে নেই।

এই দু'টি বিষয়ের সম্পর্ক হচ্ছে 'আম' (ব্যাপক) এবং পুরোপুরি 'খাস' (সুনির্দিষ্ট) হওয়ার সাথে। তা'ত্বীল এর বিষয়টি তাহরীফ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। এর অর্থ হচ্ছে, সব ধরনের তাহরীফ এই তা'ত্বীল এর মাঝে রয়েছে এবং বিপরীতভাবে সব ধরনের তা'ত্বীল কিন্তু 'তাহরীফ' এর মাঝে নেই। তাই বাতিল অর্থকে সাব্যস্ত করা এবং সঠিক অর্থকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে এ দু'টি বিষয় একসাথে পাওয়া যায় (অর্থাৎ কেউ যদি বাতিল অর্থকে সাব্যস্ত করে এবং সঠিক অর্থকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সে তাহরীফ এবং তা'ত্বীল উভয়টি করলো)। আর তাহরীফ ব্যতীত তা'ত্বীল এমন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায় যে কুরআন-সুন্নাহতে উল্লেখিত মহান আল্লাহর সিফাতসমূহকে অস্বীকার করে। সে ধারণা করে যে, এসব সিফাতের বাহ্যিক অর্থ আসলে উদ্দেশ্য নয়। অথচ সেসব সিফাতের অন্য কোনো অর্থ সে নির্ধারণ করে না। আর বিষয়টিকে তারা **'তাফউয়ীদ্ব' (মহান আল্লাহর দিকে সোপর্দকরণ)** নাম দিয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে অন্যতম একটি ভ্রান্তি হচ্ছে এটা বলা যে, এটি সালাফগণের 'মত'। যেমন পরবর্তীদের মাঝে আশ'আরী[৮০] এবং অন্যান্য সম্প্রদায় এ ধরনের বুঝকে সালাফদের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। সালাফগণ কস্মিনকালেও এসব সিফাতের অর্থ জানার বিষয়টি মহান আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করতেন না। বস্তুত সালাফগণ এমন কোনো বক্তব্য পড়তেন না যার অর্থ তারা বুঝতেন না। বরং তারা কুরআন-হাদীসের মূল বক্তব্যের অর্থ বুঝতেন কুরআন-সুন্নাহ থেকেই এবং মহান আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করতেন। অতঃপর তারা এসব সিফাতের প্রকৃত অবস্থা অথবা এসবের ধরণ মহান আল্লাহর দিকে সোপর্দ করতেন[৮১]। যেমন ইমাম মালিক

---

৮০. তাদের পরিচয়ের বিষয়টি সামনে আসবে।

৮১. 'المفوِّضة' **(মুফাউয়িদ্বাহ সম্প্রদায়):** এই সম্প্রদায় মহান আল্লাহর সিফাতসমূহকে সাব্যস্ত করে, কিন্তু তারা সেগুলোর অর্থ জানার বিষয়কে কেবল মহান আল্লাহর দিকে সোপর্দ করে। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ মহান আল্লাহর সিফাতসমূহ এবং সেগুলোর অর্থ জানাকে সাব্যস্ত করে, কিন্তু তারা সেগুলোর ধরণ বিষয়ক জ্ঞানকে মহান আল্লাহর দিকে সোপর্দ করে। কাজেই যে ব্যক্তি বলে, 'আমি সিফাতসমূহকে সাব্যস্ত করি এবং এসবের জ্ঞানকে মহান আল্লাহর দিকে সোপর্দ করি', আমরা তাকে বলবো, 'এসবের জ্ঞান' বলতে আপনি কি বুঝেন, এসবের অর্থ বিষয়ক জ্ঞান নাকি এসবের ধরণ বিষয়ক জ্ঞান?

(রাহিমাহুল্লাহ) কে যখন মহান আল্লাহর আরশের উপর ইস্তিওয়া (উপরে ওঠা) এর ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি উত্তরে বলেন,

الِاسْتِوَاءُ معلومٌ، والكيفُ مجهولٌ

"ইস্তিওয়া বা 'উপরে ওঠা' একটি জানা বিষয়। তবে এর ধরণ অজানা"[৮২]।

'تَمْثِيل' (তামসীল) এবং 'تَكْيِيف' (তাকয়ীফ) এর অর্থ এবং এদের মধ্যে পার্থক্য:

আর গ্রন্থকার রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য **'তাকয়ীফ এবং তামসীল[৮৩] ব্যতীত[৮৪]'**। এ

(অতঃপর যদি বলে অর্থ বিষয়ক জ্ঞান তবে সে মুফাউয়িদ্বাহ, আর যদি বলে ধরণ বিষয়ক জ্ঞান তবে সে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী।) **[সম্পাদক]**

৮২. বক্তব্যটি ইমাম বায়হাকী 'আল-আসমা ওয়াস সিফাত' কিতাবে (পৃ: ৫১৫) ইমাম মালিক থেকে এমন সানাদে বর্ণনা করেছেন যেটিকে হাফিয ইবনু হাজার 'ফাতহুল বারী' কিতাবে (১৩/৪০৭) উত্তম হিসেবে গণ্য করেছেন।

আর এটি ইমাম মালিকের উস্তায রাবীয়াহ আর-রা'ই থেকেও বর্ণিত হয়েছে, যা ইমাম বায়হাকী 'আল-আসমা ওয়াস সিফাত' কিতাবে (পৃ: ৫১৬) এবং লালাকাঈ 'শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ' কিতাবে (৩/৩৯৮) উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া উম্মু সালামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) থেকে মারফূ' এবং মাওকূফ উভয় সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ 'মাজমূউল ফাতাওয়া' কিতাবে (৫/৩৬৫) বলেন: ইমাম মালিকের দেওয়া আলোচ্য প্রশ্নের জবাবটি উম্মু সালামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) থেকে মারফূ' এবং মাওকূফ উভয় সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এমন কোনো সানাদে তা আসেনি যার উপর নির্ভর করা যায়। শাইখ আলবানী 'শারহুত ত্বহাউইয়্যাহ' কিতাবে (পৃ: ২৮১) মারফূ' সানাদটি সম্পর্কে বলেন: এটি সহীহ নয়। অতঃপর তিনি বলেন: সঠিক কথা হচ্ছে তা ইমাম মালিক অথবা উম্মু সালামাহ থেকে বর্ণিত, তবে প্রথমটি বেশি প্রসিদ্ধ।

৮৩. **'তামসীল' ও 'তাশবীহ':**

◉ **তামসীল:** কোনো কিছুর অনুরূপ বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করা।
◉ **তাশবীহ:** কোনো কিছুর সদৃশ সাব্যস্ত করা।

কাজেই 'তামসীল' দ্বারা কোনো কিছুর সাথে সমকক্ষতা বুঝায়, আর তা হলো সকল দিক থেকে সমমানসম্পন্ন হওয়া। অপরদিকে 'তাশবীহ' দ্বারা কোনো কিছুর সাথে সাদৃশ্য বা মিল থাকাকে বুঝায়। আর তা হলো অধিকাংশ গুণের ক্ষেত্রে সমমানসম্পন্ন হওয়া (সকল গুণের ক্ষেত্রে নয়)। অনেক সময় শব্দ দু'টির একটি অপরটিকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। **(দেখুন ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ'র 'ফাতহু রব্বিল বারিইয়্যাহ বি-তালখীসিল হামাউইয়্যাহ', পৃ: ১৯)**

৮৪. "আমরা যেসব কিতাব পড়ে থাকি সেগুলোর মধ্যে অনেক কিতাবেই আমরা 'তাশবীহ' এর

দু'য়ের মাঝে পার্থক্য হলো: 'তাকয়ীফ' হচ্ছে এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, মহান

কথা শুনি। লোকেরা 'তামসীল' এর অর্থ বোঝাতে 'তাশবীহ' শব্দটিকে উল্লেখ করে থাকে। এই দু'টির মাঝে কোনটি তাহলে অধিকতর উত্তম? আমরা কি 'তাশবীহ' ব্যবহার করবো নাকি 'তামসীল'?

আমরা বলি: 'তামসীল' ব্যবহার করাটাই অধিকতর উপযোগী। কারণ—

(ক) কুরআন মাজীদে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী: 'لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ' (কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়) (সূরা আশ-শূরা: ১১) এবং 'فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً' (কাজেই তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিও না) (সূরা আল-বাকারাহ: ২২)..... ইত্যাদি অনুরূপ আয়াতসমূহ। কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত শব্দই এক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী, তা ভিন্ন অন্য শব্দের চেয়ে। কেননা আমরা কুরআনের চেয়ে অধিক অলঙ্কারপূর্ণ এবং উদ্দীষ্ট অর্থকে অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রকাশের মত কোনো কিছু আর পাবো না। মহান আল্লাহ তাঁর কথা দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছেন তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন। এজন্য যা কুরআনের সাথে মিলে যাবে সেটাই বেশি সঠিক। এজন্য আমরা 'তামসীল' কে অস্বীকার করার কথা উল্লেখ করি। আর সকল ক্ষেত্রেই আমরা এমনটি করে থাকি। কারণ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমার্থক বা কাছাকাছি পর্যায়ের শব্দের চেয়ে কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ উল্লেখ করাটাই অধিকতর উপযোগী।

(খ) আবার কিছু মানুষের নিকট 'তাশবীহ' এর অর্থ হলো সিফাতসমূহ সাব্যস্তকরণ। এজন্য তারা আহলুস সুন্নাহকে 'মুশাব্বিহাহ' বলে নামকরণ করে থাকে। কাজেই যদি আমরা বলি 'তাশবীহ ব্যতীত', তখন এসব লোকেরা 'তাশবীহ' শব্দ দ্বারা সিফাত সাব্যস্ত করার বিষয়টি ছাড়া ভিন্ন কোনো কিছু বুঝবে না। আর এটি তখন হয়ে যাবে এমন, যেন আমরা তাকে বলছি 'সিফাতসমূহকে সাব্যস্তকরণ ব্যতীত'। তখন 'তাশবীহ' শব্দটি দ্বারা বাতিল অর্থ বুঝাবে। এজন্য তা বর্জন করাই হলো অধিকতর উত্তম।

(গ) 'তাশবীহ' কে সামগ্রিকভাবে অস্বীকার করাটাও আবার সঠিক নয়। কেননা এমন দু'টি সত্তা কিংবা গুণ খুঁজে পাওয়া যাবে না যেগুলোর মাঝে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকবে না। আর এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যই হল এক প্রকার 'তাশবীহ'। এজন্য আমরা যদি 'তাশবীহ' কে পুরোপুরি অস্বীকার করি, তাহলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে যেসব সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলোকে অস্বীকার করা হবে। যেমন: অস্তিত্ব, মৌলিকভাবে স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়েরই এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এটি এক প্রকার সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং এক প্রকার 'তাশবীহ' বা সাদৃশ্য। তবে এই দু'টি অস্তিত্বের মাঝে ব্যাপক তফাৎ রয়েছে। স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকাটা আবশ্যিক, আর সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকাটা সম্ভব। অনুরূপভাবে শ্রবণশক্তি, এক্ষেত্রেও সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মানুষের শ্রবণশক্তি রয়েছে, আবার স্রষ্টারও তা রয়েছে। তবে উভয়ের শ্রবণশক্তির মাঝে ব্যাপক তফাৎ রয়েছে। তথাপি মৌলিকভাবে শ্রবণশক্তি থাকাটা এক প্রকার সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

এজন্য যদি আমরা বলি 'তাশবীহ ব্যতীত', সেক্ষেত্রে আমাদের 'তাশবীহ' কে পুরোপুরি অস্বীকার করতে হবে এবং তখন এক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যার সৃষ্টি হবে। এজন্য আমরা মনে করি, উল্লেখিত তিন দিক থেকে 'তামসীল ব্যতীত' কথাটি ব্যবহার করাই অধিকতর

আল্লাহর সিফাতসমূহ এরূপ এরূপ অথবা তাঁর সিফাতের রূপ বা ধরণ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা তা কেমন (যেমন প্রশ্ন করা: আল্লাহ রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে কীভাবে নেমে আসেন?)।

আর 'তামসীল' হচ্ছে এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, তাঁর সিফাতসমূহ তাঁর মাখলূকের সিফাতের অনুরূপ (যেমন বলা: আল্লাহর হাত অমুকের হাতের মত)। তার বক্তব্য **'তাকয়ীফ ব্যতীত'** কথাটি দ্বারা এটি উদ্দেশ্য নয় যে, তারা সিফাতসমূহের ধরণকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। কারণ নিঃসন্দেহে প্রত্যেকটি জিনিসের কোনো না কোনো রূপ বা ধরণ আছে। তবে এটি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা এসব সিফাতের রূপ বা ধরণ সংক্রান্ত জ্ঞান তাদের নিকট থাকার বিষয়টিকে অস্বীকার করে। কেননা মহান আল্লাহর যাত (সত্তা) এবং তাঁর সিফাতসমূহের রূপ বা ধরণ কেবল তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।

তাঁর বক্তব্য **'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়'**; এটি মহান আল্লাহর কিতাবের একটি দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট আয়াত যা মহান আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলি সংক্রান্ত বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের দুস্তুর (সংবিধান)[৮৫]। উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ না-সূচক এবং হ্যাঁ-সূচক উভয় বিষয়কে একত্রিত করেছেন। তিনি তাঁর নিজের 'মিস্‌ল' বা অনুরূপ কিছু থাকাকে অস্বীকার করেছেন এবং নিজের ক্ষেত্রে শোনা এবং দেখার বিষয়টি সাব্যস্ত করেছেন। কাজেই এটি প্রমাণ করে, এসব সিফাতকে মু'আত্ত্বিলাহ (নিষ্ক্রীয়কারী ও বাতিলকারী) সম্প্রদায়ের মত পুরোপুরি অস্বীকার করাটা সঠিক নীতি নয়। আবার এসব সিফাতকে মুমাস্‌সিলাহ (সাদৃশ্য প্রদানকারী) সম্প্রদায়ের মত পুরোপুরি কোনো কিছুর মত করে সাব্যস্ত করাটাও সঠিক নীতি নয়। বরং সেগুলোকে সাব্যস্ত করতে হবে 'তামসীল' বা সাদৃশ্য প্রদান ব্যতীত।

'لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ' আয়াতটির ই'রাব (কোনো শব্দের শেষ অক্ষরে স্বরধ্বনি কেমন হবে তা নিরূপণ বা ঘটন প্রণালী) বিষয়ে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সর্বাধিক সঠিক কথা হচ্ছে, এখানে 'কাফ' Preposition টি অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছে জোরপ্রদানের জন্য। যেমন কবির ভাষায়:

উপযোগী"। **(দেখুন ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ'র 'শারহুল আকীদাতিল ওয়াসেত্বিয়্যাহ', খণ্ড: ১, পৃ: ১১১-১১২)**

৮৫. এটি একটি ফার্সী শব্দ যার অর্থ আইন-কানুন বা মূলভিত্তি।

বা গুণের ধরণ সাব্যস্ত করার সাথে সাথে সাদৃশ্য স্থাপনের বিষয়টিও শর্তযুক্ত করে থাকে। আর 'তাকয়ীফ' কোনো সিফাত বা গুণের কেবল ধরণ সাব্যস্ত করে থাকে, কোনো সাদৃশ্য স্থাপনের বিষয় এক্ষেত্রে শর্তযুক্ত থাকে না[৮৯]।

পূর্বোল্লিখিত এই ৪টি বিষয়ের হুকুম: এগুলো সবই হারাম। আবার এদের মাঝে কিছু কিছু আছে কুফর বা শির্ক পর্যায়ের। এজন্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এমন সকল বিষয় থেকে নিজেদেরকে মুক্ত ও পবিত্র রাখেন।

সম্পর্কিত"। **(দেখুন ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ'র 'ফাতহু রব্বিল বারিইয়্যাহ বি-তালখীসিল হামাউইয়্যাহ', পৃ: ২০)**

৮৯. **তামসীল ও তাকয়ীফ এর মধ্যে পার্থক্য করার বিষয়টি নিম্নোক্তভাবে বুঝলে সহজ হবে:**

১- কেউ যদি কাউকে আল্লাহর সত্তা বা গুণ কেমন তা প্রশ্ন করে, তখন সেটার জবাব যা-ই প্রদান করা হবে সেটা তাকয়ীফ বা ধরণ নির্ধারণ বলে বিবেচিত হবে।

২- আর যদি কেউ কাউকে আল্লাহর সত্তা ও গুণের উদাহরণ দিতে বলে, তখন সেটার জবাবে যা-ই প্রদান করা হবে তা-ই তামসীল বা সাদৃশ্য প্রদান হিসাবে বিবেচিত হবে।

অনুরূপভাবে,

১- যখন কোনো নির্দিষ্ট সত্তার সাথে সম্পৃক্ত না করে আল্লাহর সত্তা বা কোনো গুণকে বর্ণনা করা হবে, তখন সেটাকে বলা হবে তাকয়ীফ বা ধরণ নির্ধারণ করা। যেমন এটা বলা যে, আল্লাহর হাত সৃষ্টির হাতের মত।

২- কিন্তু যখন কোনো নির্দিষ্ট সত্তার সাথে সম্পৃক্ত করে আল্লাহর সত্তা বা কোনো গুণকে বর্ণনা করা হবে, তখন সেটাকে বলা হবে তামসীল বা সাদৃশ্য প্রদান করা। যেমন এটা বলা যে, আল্লাহর হাত আমার হাতের মত, বা যায়েদের হাতের মত। **[সম্পাদক]**

মহান আল্লাহর চেহারা
(الوجه)

وَقوله: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ} ، {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ}

মহান আল্লাহর বাণী, "আর অবিনশ্বর শুধু মহিমময় ও মর্যাদাসম্পন্ন আপনার রবের চেহারা"[২৯২]।

"আল্লাহর চেহারা ছাড়া সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল"[২৯৩]।

মুহাম্মাদ খলীল হাররাস রাহিমাহুল্লাহ'র ব্যাখ্যা

মহান আল্লাহর 'وَجْه' (চেহারা) সাব্যস্তকরণ এবং তা অস্বীকারকারীদের বক্তব্য খণ্ডন:

মহান আল্লাহর বাণী 'وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ...' **(আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের চেহারা....)**। আয়াত দু'টিতে মহান আল্লাহর 'وَجْه' (চেহারা) নামক সিফাত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

কুরআন-সুন্নাহ তে মহান আল্লাহর চেহারা সাব্যস্ত হওয়ার অসংখ্য দলীল রয়েছে। সবগুলো দলীলই মু'আত্ত্বিলাহ সম্প্রদায়ের অপব্যাখ্যাকে খণ্ডন করে, যারা মহান আল্লাহর চেহারাকে 'جِهَة' (দিক), 'ثَوَاب' (পুরস্কার) কিংবা 'ذَات' (সত্তা) হিসেবে ব্যাখ্যা করে থাকে[২৯৪]। তবে হকপন্থী সম্প্রদায় যে আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে

---

২৯২. সূরা আর-রহমান: ২৭

২৯৩. সূরা আল-কাসাস: ৮৮

২৯৪. অধিকন্তু, তাহরীফকারী সম্প্রদায় মহান আল্লাহর চেহারাকে তাঁর (সওয়াব) পুরস্কার হিসেবে ব্যাখ্যা করে থাকে। তারা বলে: আয়াতটিতে উল্লেখিত চেহারা দ্বারা সওয়াব (পুরস্কার) বুঝানো হয়েছে। প্রত্যেকটি জিনিসই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তবে মহান আল্লাহর পুরস্কার ব্যতীত!

এর ওপর ভিত্তি করে তারা আল্লাহর 'চেহারা' যা কিনা মহান আল্লাহর একটি পূর্ণতাজ্ঞাপক সিফাত, সেটার (ভিন্ন) ব্যাখ্যা করেছে, তারা এর ব্যাখ্যা করেছে মাখলূক হিসেবে, যা মহান আল্লাহ থেকে আলাদা, যা অস্তিত্বশীল বা অস্তিত্বহীন উভয়টিই হতে পারে; কেননা এই সওয়াব

(পুরস্কার) এর বিষয়টি পরে ঘটেছে, যা পূর্বে অস্তিত্বহীন ছিল। আবার এটাও সম্ভব যে, অস্তিত্বশীল হওয়ার পরে একে উঠিয়ে নেওয়া হবে, যদি না মহান আল্লাহ তা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। অর্থাৎ এই পুরস্কারকে উঠিয়ে নেওয়াটা যৌক্তিকভাবে সম্ভব।

এখন কি তাহলে আপনারা বলবেন যে, মহান আল্লাহর চেহারা যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, তা কোনো সম্ভাব্য বিষয় নাকি অপরিহার্য বিষয়? যদি তারা সওয়াবের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে, তখন তা একটি সম্ভাব্য বিষয়ে পরিণত হবে, যার অস্তিত্ব থাকতেও পারে আবার নাও পারে।

নিম্নবর্ণিত কারণে তাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যাত:

(ক) এটি শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত। কারণ শব্দের প্রকাশ্য অর্থ থেকে জানা যায় যে, 'ওয়াজহ' হলো সুনির্দিষ্ট চেহারা, তা কোনো সওয়াব নয়।

(খ) এটি সালাফদের ইজমা'র বিপরীত। কারণ কোনো একজন সালাফও বলেননি যে, মহান আল্লাহর চেহারা দ্বারা সওয়াব উদ্দেশ্য! তাদের কিতাবাদি আমাদের নিকটেই রয়েছে, যেগুলো গ্রন্থ আকারে সংরক্ষিত। আমাদের জন্য সাহাবী, তাবে'ঈ ইমামগণ এবং নেক কাজে তাদের অনুসারীদের থেকে একটি মাত্র বক্তব্য আনুন যেখানে তারা এই ব্যাখ্যা করেছেন। আপনারা কখনো এর কোনো উপায় খুঁজে পাবেন না।

(গ) পুরস্কারকে কি 'ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَام' (পরিপূর্ণ মহিমা ও মহানুভবতার অধিকারী) নামক এসব মহান গুণে গুণান্বিত করা সম্ভব? সম্ভব নয়। যদি আমরা উদাহরণস্বরূপ বলি, মুত্তাকীদের প্রতিদান হচ্ছে পরিপূর্ণ মহিমা ও মহানুভবতার অধিকারী! সেক্ষেত্রে এটি কখনো সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ এসব গুণে গুণান্বিত করেছেন চেহারাকে, যা মহিমা ও মহানুভবতার অধিকারী।

(ঘ) আমরা বলবো: আপনারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এই হাদীস বিষয়ে তাহলে কি বলবেন যেখানে তিনি বলেছেন: 'حِجَابُهُ النُّورُ أَوِ النَّارُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ' (মহান আল্লাহর হিজাব হলো নূর কিংবা আগুনের। যদি তিনি তা উন্মুক্ত করতেন, তাহলে তাঁর চেহারার উজ্জ্বলতা তাঁর দৃষ্টি যতদূর যায় এবং তাতে যত মাখলূক রয়েছে সবকিছুকেই ভস্মীভূত করে দিতো) (মুসলিম: ১৭৯)। কাজেই সওয়াবের কি এই নূর রয়েছে, যা মহান আল্লাহর দৃষ্টি যতদূর যায় তাতে থাকা মাখলূকসমূহকে ভস্মীভূত করে দিবে? কখনোই তা সম্ভব নয়।

এর ভিত্তিতে আমরা তাদের বাতিল বক্তব্যের বিষয়ে জানতে পারি। কাজেই আমাদের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে এই 'وجه' কে মহান আল্লাহ যা বুঝিয়েছেন সেভাবে ব্যাখ্যা করা। আর তা হলো মহান আল্লাহর সাথে স্থায়ীভাবে থাকা চেহারা, যা পরিপূর্ণ মহিমা ও মহানুভবতার গুণে গুণান্বিত।

আর যদি আপনি বলেন: মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে 'الوجه' শব্দ যেখানেই বর্ণিত হয়েছে সেখানেই কি এর দ্বারা মহান আল্লাহর চেহারাই উদ্দেশ্য যা তাঁর সিফাত?

এর জবাব হলো: এটিই হচ্ছে মূল, এটিই হচ্ছে আসল নীতি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন: 'وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ' (আর যারা তাদের রবকে ভোরে ও সন্ধ্যায় তার চেহারা দর্শনের জন্য ডাকে তাদেরকে আপনি বিতাড়িত করবেন না) (সূরা আল-আন'আম: ৫২)। আর তাঁর বাণী: 'الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَكّٰى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزٰى إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى' (যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য এবং তার প্রতি কারও এমন কোনো অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান দিতে হবে, শুধু তার মহান রবের চেহারা দেখার প্রত্যাশায়; আর অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে) (সূরা আল-লাইল: ১৮-২১).....ইত্যাদি অনুরূপ আয়াতসমূহ।

মূল হচ্ছে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত 'وجه' দ্বারা তাঁর চেহারাকেই বুঝায়, যা তাঁর অন্যতম একটি সিফাত। তবে এখানে একটি শব্দ রয়েছে যার ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ মতভেদ করেছেন। আর তা হলো, মহান আল্লাহর বাণী: 'وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ' (আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সেটাই আল্লাহর দিক) (সূরা আল-বাকারাহ: ১১৫)। এখানে 'فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا' (সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও) এর অর্থ হলো: তোমরা সালাত আদায়ের সময় যে দিকেই মুখ ফিরাও। আর 'فَثَمَّ' (সেখানেই), অর্থাৎ মহান আল্লাহর দিক সেদিকেই।

তাদের মাঝে যারা বলেন: 'وجه' শব্দের অর্থ 'جِهَة' (দিক), যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন: 'وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا' (আর প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে, যে দিকে সে চেহারা ফিরায়) (সূরা আল-বাকারাহ: ১৪৮)। কাজেই 'وجه' শব্দটি দ্বারা 'جِهَة' (দিক) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সেদিকেই মহান আল্লাহর দিক। অর্থাৎ সেদিকেই মহান আল্লাহর দিক যেদিকে মুখ করে আদায় করা তোমাদের সালাত তিনি কবুল করেন।

তারা বলেন: এর কারণ হচ্ছে আয়াতটি সফরের বিষয়ে নাযিল হয়েছে, যখন মানুষ নফল সালাত আদায় করে, তার চেহারা যেদিকেই থাকুক সে সালাত আদায় করতে পারে। অথবা যখন সে (ফরয সালাতের) কিবলার বিষয়ে দ্বিধান্বিত হয়, তখন সে তা খুঁজতে থাকে এবং যেদিকে পারে সেদিকে মুখ করে সালাত আদায় করে নেয়।

তবে সঠিক কথা হচ্ছে, 'وجه' (চেহারা) দ্বারা এখানে মহান আল্লাহর প্রকৃত চেহারা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকেই মহান আল্লাহর চেহারা। কারণ মহান আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সাব্যস্ত রয়েছে যে, মুসল্লী যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন মহান আল্লাহ তার সামনের দিকে থাকেন (বুখারী: ৪০৬)। এজন্য কাউকে তার চেহারার সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যেহেতু মহান আল্লাহ তার সামনের দিকে থাকেন।

কাজেই আপনি যদি এমন কোনো স্থানে সালাত আদায় করেন যেখানে আপনি কিবলার বিষয়ে জানেননা, আপনি তা খুঁজতে থাকেন এবং সালাত আদায় করেন, আর এরপর বাস্তবেই যদি এটা পাওয়া যায় যে, আপনার কিবলা পিছনের দিকে ছিল, মহান আল্লাহ এমন পরিস্থিতিতেও আপনার চেহারার সামনে থাকবেন। এই অর্থটি সঠিক, যা আয়াতটির বাহ্যিক অর্থের সাথে মিলে যায়।

তা হলো— ‘وَجْه’ (চেহারা) সিফাতটি মহান আল্লাহর ‘ذَات’ (সত্তা) থেকে ভিন্ন একটি সিফাত। এই সিফাতকে সাব্যস্ত করা দ্বারা এটা বোঝায় না যে, মহান আল্লাহ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত, যেমনটি মুজাস্‌সিমাহ (দেহবাদী) সম্প্রদায় বলে থাকে। বরং এটি মহান আল্লাহর সত্তার উপযোগী একটি সিফাত। মহান আল্লাহর চেহারা অন্য কোনো চেহারার অনুরূপ নয়, আর না অন্য কোনো চেহারা তাঁর চেহারার অনুরূপ।

মু‘আত্ত্বিলাহ সম্প্রদায় এ দু’টি আয়াতের মাধ্যমে যুক্তি পেশ করে থাকে যে, এখানে ‘وَجْه’ (চেহারা) বলতে কেবল ‘ذَات’ (সত্তা) বুঝানো হয়েছে। কারণ চেহারার ক্ষেত্রে এমন খাস কিছু নেই যে, তা চিরস্থায়ী হবে এবং ধ্বংস হবে না।

আমরা তাদের এই যুক্তির ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করি এভাবে যে, যদি মহান আল্লাহর প্রকৃতপক্ষে কোনো চেহারা না থাকতো, সেক্ষেত্রে এই ‘وَجْه’ (চেহারা) শব্দটি ‘ذَات’ (সত্তা) অর্থে ব্যবহৃত হতো না। কারণ কোনো অর্থপূর্ণ শব্দ যখন কোনো একটি অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন তা অন্য কোনো অর্থে ব্যবহার করা যাবে না, যদি না শব্দের মূল অর্থটি বর্ণিত সত্তার জন্য সাব্যস্ত হয়। কারণ এক্ষেত্রে চিন্তা পরিবর্তিত হয়ে শব্দের মূল আবশ্যিক (মালযূম) অর্থ থেকে বের হয়ে এর আবশ্যিক করে নেওয়া (লাযেম) অর্থের দিকে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

আর প্রথম অর্থটিও বাস্তবে এর বিরোধী নয়।

যদি আমরা বলি: সেদিকেই মহান আল্লাহর দিক এবং সেখানে কোনো দলীল থাকে; হোক এই দলীল আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতটির দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা অথবা হোক সে দলীল হাদীসে যা এসেছে তা। কেননা আপনি যদি আপনার সালাতে মহান আল্লাহর দিকে মুখ ফেরান, সেটিই হবে মহান আল্লাহর দিক, যেদিকে মুখ করে আদায় করা আপনার সালাত তিনি কবুল করেন। তাহলে বলা যায়, সেদিকে প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর চেহারাও থাকে। সেক্ষেত্রে এই দুই অর্থ আসলে পরস্পরবিরোধী নয়।

আর আপনার জানা উচিত যে, মহান আল্লাহর এই সুমহান চেহারা যা পরিপূর্ণ মহিমা ও মহানুভবতার গুণে গুণান্বিত, তা কোনো বর্ণনা দ্বারা পরিবেষ্টন করা যাবে না, আর না তা কোনো চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনা দ্বারা পরিবেষ্টন করা যাবে। বরং যা কিছুই আপনি অনুমান করেন না কেন, মহান আল্লাহ তা থেকে বহুগুণে ঊর্ধ্বে। যেমন তিনি বলেন: ‘وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً’ (কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না) (সূরা ত্বা-হা: ১১০)। **(দেখুন ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ্‌র ‘শারহুল আকীদাতিল ওয়াসেত্বিয়্যাহ’, খণ্ড: ১, পৃ: ২৮৭-২৯০)**

যাইহোক, তাদের রূপক অর্থ সাব্যস্ত করার জবাব অন্যভাবেও দেওয়া যেতে পারে। যেমন "মহান আল্লাহ 'চেহারা' শব্দটিকে সাধারণ অর্থে প্রয়োগ করে 'সত্তা' অর্থটি উদ্দেশ্য করেছেন" এমন কথা বলার পরিবর্তে বলতে হবে: "মহান আল্লাহ তাঁর চেহারাকে চিরস্থায়ী হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, যা তাঁর সত্তা চিরস্থায়ী হওয়াকে আবশ্যক করে"[২৯৫]।

ইমাম বায়হাকী আল-খাত্তাবী থেকে উল্লেখ করেছেন যে, মহান আল্লাহ যখন চেহারাকে তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং তাঁর চেহারার সাথে একটি বিশেষণ যুক্ত করেছেন তখন তিনি বলেন, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَام "আর অবিনশ্বর শুধু মহিমময় ও মর্যাদাসম্পন্ন আপনার রবের চেহারা"। এটি দলীল বহন করে যে, এখানে তাঁর চেহারার বিষয়টি উল্লেখ করাটা [কোনো অতিরিক্ত সংযোগ হিসেবে নয়][২৯৬]। আর তাঁর 'ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَام' (মহিমময় ও

---

২৯৫. "কতিপয় অজ্ঞ-মূর্খ ও নির্বোধ লোক এই মতের দিকে গিয়েছে যে, মহান আল্লাহ ধ্বংস হয়ে যাবেন তবে তাঁর চেহারা ছাড়া। তারা এক্ষেত্রে দলীল পেশ করে মহান আল্লাহর যে বাণী: 'كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ' (তাঁর চেহারা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল) (সূরা আল-কাসাস: ৮৮)। কিন্তু এ এক বড় ভ্রান্তি। কেননা মহান আল্লাহ একথা বলে তাঁর নিজের প্রশংসা করেননি যে, তিনি তাঁর চেহারা ছাড়া ধ্বংস হয়ে যাবেন। তবে তিনি তাঁর সত্তার জন্য চেহারার কথা বলেছেন। কেননা চেহারা 'মহিমময় ও মর্যাদাসম্পন্ন' হওয়া দ্বারা গুণান্বিত। আর মানুষের ক্ষেত্রে চেহারা হচ্ছে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন বিষয়। এজন্য মহান আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য চেহারার কথা উল্লেখ করে বলেছেন: 'وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ' (আর বাকি থাকবে কেবল আপনার রবের চেহারা) এবং 'كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ' (তাঁর চেহারা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল)"। **(দেখুন ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ'র 'শারহু ফাতহি রব্বিল বারিয়্যাহ বি-তালখীসিল হামাউয়্যাহ', পৃ: ২৬৮)**

২৯৬. মুদ্রণে 'لَيْسَ بِصِلَةٍ' (কোনো অতিরিক্ত সংযোগ হিসেবে নয়) এভাবে এসেছে।

(অর্থাৎ আরবী ভাষার ই'রাব বা তারকীব অনুসারে يَبْقَى হচ্ছে ফে'ল বা ক্রিয়া, আর وَجْهُ হচ্ছে তার ফা'য়েল বা কর্তা। অর্থাৎ এর অর্থ 'বাকী থাকবে চেহারা'। আবার এ চেহারার 'সিফাত' বা গুণ হিসাবে এসেছে ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَام 'সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন'। এভাবে চেহারার বর্ণনা আসার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, এখানে চেহারা বুঝানোই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য। কারণ যদি সত্তা উদ্দেশ্য হতো তবে সত্তা রব্ব এর গুণ বর্ণনা করা হতো। তখন ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَام না হয়ে হতো ذى الْجَلالِ وَالإِكْرَام। সুতরাং 'ওয়াজহ' বলে 'চেহারা'-ই বুঝানো হয়েছে, শুধু 'যাত' বা সত্তা না।) **[সম্পাদক]**

যেমনভাবে মহান আল্লাহ সত্তা 'রব্ব' এর গুণ উল্লেখ করে একই সূরায় বলেছেন: 'تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ' (কত বরকতময় আপনার রব্বের নাম, যিনি মহিমময় ও মর্যাদাসম্পন্ন!) (সূরা আর-রহমান: ৭৮)। **(দেখুন ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ্‌র 'শারহুল**

আকীদাতিল ওয়াসেত্বিয়্যাহ', খণ্ড: ১, পৃ: ২৮৫)

অর্থাৎ 'মহিমময় ও মর্যাদাসম্পন্ন' কথাটি মহান আল্লাহর চেহারার গুণ হিসেবে এসেছে, আবার তাঁর সত্তার গুণ হিসেবেও এসেছে। তাঁর সত্তার গুণ সাব্যস্ত করতে গিয়ে তাঁর চেহারার গুণকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

এ বিষয়ে শাইখ আব্দুর রহীম আস-সুলামী 'শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসেত্বিয়্যাহ' কিতাবে (৮/৬) বলেন:

"বিদ'আতীরা মহান আল্লাহর 'চেহারা' কে অপব্যাখ্যা করে। কখনো কখনো তারা বলে, وَجْه (চেহারা) এখানে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে এসেছে। এর অর্থ হলো, 'ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام' (আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রব, যিনি মহিমময় ও মর্যাদাসম্পন্ন), যেমন তিনি বলেছেন: 'لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ' (কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা) (সূরা আশ-শূরা: ১১)। এখানে যে 'কাফ' রয়েছে তা অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে, তা সাদৃশ্য দেওয়া হিসেবে নয় [অর্থাৎ এখানে 'مثل' শব্দের অর্থ 'মত বা অনুরূপ', এর সাথে 'كَ' (মত) শব্দটি অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছে]। কেননা যদি সাদৃশ্য দেওয়া হিসেবে এর অর্থ থাকতো যেমনটি তারা (বিদ'আতীরা) ধারণা করে, তখন এর অর্থ হতো: 'ليس كمثل مثله شيء' (কোনো কিছুই তাঁর উপমা বা সদৃশের মত নয়)। ফলে এটা সাব্যস্ত হতো যে, মহান আল্লাহর উপমা বা সদৃশ কিছু আছে এবং এরপর এই 'সদৃশ' এর অনুরূপ কিছু থাকাকে অস্বীকার করা হচ্ছে।

নিঃসন্দেহে এরূপ কথা বাতিল। কেননা এখানে যে 'কাফ' রয়েছে তা জোরপ্রদান এবং অতিরিক্ত হিসেবে। এটা কোনো উপমাকে অন্য কোনো উপমার সাথে সাদৃশ্যপ্রদানের জন্য নয়। তবে মহান আল্লাহর বাণী 'وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَام' (আর অবিনশ্বর শুধু মহিমময় ও মর্যাদাসম্পন্ন আপনার রবের চেহারা) (সূরা আর-রহমান: ২৭), এক্ষেত্রে এটা বলা সঠিক নয় যে, 'وَجْه' (চেহারা) শব্দটি একটি অতিরিক্ত সংযোজন। কেননা মহান আল্লাহর বাণীতে থাকা 'ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَام' (মহিমময় ও মর্যাদাসম্পন্ন) গুণটি চেহারার জন্য সংযোজিত হয়েছে।

অতঃপর কিভাবে এটা বলা যেতে পারে যে, তা (চেহারা) একটি অতিরিক্ত বিষয়, যেখানে সহীহুল বুখারীতে সাব্যস্ত রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: 'حِجَابُهُ النُّورُ أَوِ النَّارُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَات وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ' (মহান আল্লাহর আবরণ বা পর্দা হলো নূর কিংবা আগুনের। যদি তিনি তা উন্মুক্ত করতেন, তাহলে তাঁর চেহারার উজ্জ্বলতা তাঁর দৃষ্টি যতদূর যায় এবং তাতে যত মাখলূক রয়েছে সবকিছুকেই ভস্মীভূত করে দিতো)। যদি বলা হতো তা (চেহারা) একটি অতিরিক্ত বিষয়, তখন হাদীসটি অর্থহীন হয়ে যেতো"। **(অনুবাদক)**

উল্লেখ্য যে, 'ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَام' (মহিমা ও মর্যাদার অধিকারী) শব্দগুচ্ছ মহান আল্লাহর নাম হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। এটি হচ্ছে মহান আল্লাহর সিফাত বা গুণের সাথে 'যূ' (অধিকারী বা ওয়ালা) যুক্ত নাম (কিতাবুত তাওহীদ লিবনি মানদাহ: ২/২০২, শারহু বুলূগিল মারাম লিবনি উসাইমীন: ২২-৪৭)। এটি ইসমে আ'যম হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, যার মাধ্যমে দু'আ করা হলে

মর্যাদাসম্পন্ন) কথাটি তাঁর চেহারার জন্য একটি সিফাত (বিশেষণ) হয়েছে। আর তাঁর চেহারা তাঁর সত্তার একটি সিফাত[২৯৭]।

'চেহারা' শব্দটিকে 'সত্তা' কিংবা অন্য কোনো অর্থে কিভাবে অপব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত ত্বায়েফের হাদীসে রয়েছে, أعوذُ بنورِ وجهِكَ الَّذِي أشرقتْ لَهُ الظُّلُمات... "আমি আপনার চেহারার নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা অন্ধকারকে আলোকোদ্ভাসিত করে..."[২৯৮]।

এছাড়া আবূ মূসা আশ'আরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, حِجَابُهُ النُّورُ أَوِ النَّارُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ "মহান আল্লাহর হিজাব (আবরণ বা পর্দা) হলো নূর কিংবা আগুনের। যদি তিনি তা উন্মুক্ত করতেন, তাহলে

মহান আল্লাহ তা কবুল করেন (তিরমিযী: ৩৫৪৪, শাইখ আলবানীর মতে সহীহ)। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে সর্বদা 'يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَام' (হে মহিমা ও মর্যাদার অধিকারী!) বলে দু'আ করতে বলেছেন (তিরমিযী: ৩৫২৫, শাইখ আলবানীর মতে সহীহ)। **(অনুবাদক)**

২৯৭. অনুরূপভাবে মসজিদে প্রবেশের দু'আ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, 'أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ' (আমি মহান আল্লাহর নিকট তাঁর সম্মানিত চেহারা এবং চিরন্তন ক্ষমতার মাধ্যমে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি) (আবূ দাউদ: ৪৬৬, শাইখ আলবানীর মতে সহীহ)। এখানে মহান আল্লাহর সত্তা এবং চেহারাকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, চেহারা মহান আল্লাহর সত্তা থেকে ভিন্ন একটি সিফাত। আর এতে তাদের বক্তব্যেরও খণ্ডন রয়েছে যারা 'চেহারা' কে 'পুরস্কার' হিসেবে অপব্যাখ্যা করে। কেননা 'ইসতি'আযাহ' (আশ্রয় প্রার্থনা) মহান আল্লাহর নাম ও গুণের ওসীলায় করা যায়, কোনো মাখলূকের ওসীলায় নয়। অর্থাৎ 'চেহারা' মহান আল্লাহর একটি সত্তাগত গুণ, এটি কোনো মাখলূক (পুরস্কার) নয়।

উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহর গুণের ওসীলায় দু'আ করা জায়েয হলেও স্বয়ং তাঁর গুণকে ডাকা বা গুণের নিকট দু'আ করাটা কুফর। যেমন বলা যে, 'হে আল্লাহর চেহারা! আমাকে অমুক জিনিস দান কর'। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: 'إن دعاء صفة من صفات الله كفرٌ بالاتفاق' (মহান আল্লাহর কোনো গুণের কাছে দু'আ করাটা সর্বসম্মতিক্রমে কুফর)। (দেখুন ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ'র 'লিকাউল বাবিল মাফতূহ': ৫/২২) **(অনুবাদক)**

২৯৮. সানাদ দুর্বল। ইবনু ইসহাক বর্ণনাটিকে সানাদবিহীনভাবে ত্বায়েফের কিস্‌সা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শাইখ আলবানী আল-গাযালীর 'ফিকহুস সীরাহ' কিতাবের তাখরীজে (পৃ: ১৩২) একে দুর্বল বলেছেন।

তাঁর চেহারার উজ্জ্বলতা তাঁর দৃষ্টি যতদূর যায় এবং তাতে যত মাখলূক রয়েছে সবকিছুকেই ভস্মীভূত করে দিতো”[২৯৯]।

ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ’র সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

‘وَجْه’ (চেহারা):

‘وَجْه’ (চেহারা) মহান আল্লাহর অন্যতম একটি সত্তাগত গুণ এবং তাঁর জন্য যেভাবে শোভনীয়, সেভাবে প্রকৃত অর্থেই তা তাঁর জন্য সাব্যস্ত। এর দলীল হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالاكْرَام “আর অবিনশ্বর শুধু মহিমময় ও মর্যাদাসম্পন্ন আপনার রব্বের চেহারা”[৩০০]।

এখানে ‘جلال’ (জালাল) হচ্ছে ‘عظمة’ (আযমাহ) বা মহত্ত্ব ও বড়ত্ব। আর ‘إكرام’ (ইকরাম) হচ্ছে অনুগত বান্দাদেরকে তাদের জন্য প্রস্তুতকৃত সম্মান ও মর্যাদা প্রদান। মহান আল্লাহর ‘وَجْه’ (চেহারা) এর তাফসীর ‘ثواب’ (পুরস্কার) করাটা মোটেও জায়েয নয়। কারণ তা শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত, সালাফদের ইজমা’র বিপরীত এবং শরীয়তে এর কোনো দলীল-প্রমাণ নেই।

২৯৯. ইমাম মুসলিম হাদীসটিকে ‘কিতাবুল ঈমান’ এ বর্ণনা করেছেন (অধ্যায়: ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ ঘুমান না’, হাদীস: ১৭৯, নাওয়াউয়ী: ৩/১৬)। আর ‘سُبُحَات وَجْهِهِ’ (তাঁর চেহারার উজ্জ্বলতা) এর অর্থ সম্পর্কে তিনি বলেন: তাঁর নূর এবং মহত্ত্ব।

৩০০. সূরা আর-রহমান: ২৭

মহান আল্লাহর হাত
(اليد)

وَقوله: {مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} ، {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء}

আর মহান আল্লাহর বাণী, "আমি যাকে আমার দু'হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিল?"[৩০১]

"আর ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত রুদ্ধ। তাদের হাতই রুদ্ধ করা হয়েছে এবং তারা যা বলে সে জন্য তারা অভিশপ্ত। বরং আল্লাহর উভয় হাতই প্রসারিত; যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন"[৩০২]।

মুহাম্মাদ খলীল হাররাস রাহিমাহুল্লাহ'র ব্যাখ্যা

মহান আল্লাহর 'يَد' (হাত) সাব্যস্তকরণ এবং তা অস্বীকারকারীদের বক্তব্য খণ্ডন:

মহান আল্লাহর বাণী, '**مَا مَنَعَكَ...**' **(তোমাকে কিসে বাধা দিল...)**। আয়াত দু'টিতে মহান আল্লাহর দুই হাত সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা তাঁর সত্তার উপযোগী প্রকৃত সিফাত[৩০৩]। প্রথম আয়াতে আদমকে সিজদাহ না করার কারণে তিনি ইবলীসকে

---

৩০১. সূরা সাদ: ৭৫

৩০২. সূরা আল-মায়েদা: ৬৪

৩০৩. যদি কেউ বলে: তোমরা সাব্যস্ত করে থাক যে, মহান আল্লাহর প্রকৃত হাত রয়েছে। অথচ আমরা হাতের ক্ষেত্রে সৃষ্টির হাত ব্যতীত অন্য কোনো হাত বিষয়ে অবগত নই। কাজেই তোমাদের কথা থেকে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সাদৃশ্য প্রদানের বিষয়টি অপরিহার্য হয়ে যায়।

এর জবাবে আমরা বলবো: মহান আল্লাহর হাত সাব্যস্ত করার মাধ্যমে এটা অপরিহার্য হয় না যে, আমরা স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য প্রদান করছি। কেননা মহান আল্লাহর প্রকৃত হাত সাব্যস্ত করার বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফদের ইজমা'তে উল্লেখিত হয়েছে। আর সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সাদৃশ্যপ্রদানের বিষয়টি নাকচ করার ব্যাপারে শার'ঈ, আকলী (বুদ্ধিবৃত্তিক) এবং মানবেন্দ্রিয়ভিত্তিক দলীল রয়েছে:

◉ **শারঈ দলীল:** মহান আল্লাহর বাণী: 'لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ' (কোনো

তিরষ্কার করেছেন, যে আদমকে তিনি তাঁর দু'হাতে সৃষ্টি করেছেন।

এখানে তাঁর দু'হাতকে তাঁর কুদরত তথা শক্তি বা ক্ষমতা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা যাবে না। কারণ মহান আল্লাহ তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকে এমনকি ইবলীসকেও তাঁর কুদরতের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই যদি আদমকে দু'হাতে সৃষ্টি না করে কেবল কুদরতের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হতো, সেক্ষেত্রে তাকে আলাদা করে উল্লেখ করার মাঝে কোনো বিশেষত্ব থাকতো না।

আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ بِيَدِهِ: خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ، وَكَتَبَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، وَغَرَسَ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهِ

"মহান আল্লাহ ৩টি জিনিসকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন: তিনি আদমকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাওরাত নিজ হাতে লিখেছেন এবং 'আদ্‌ন জান্নাতে তিনি নিজ হাতে বৃক্ষরোপণ করেছেন"[৩০৪]।

কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা) (সূরা আশ-শূরা: ১১)।

◉ **আকলী (বুদ্ধিবৃত্তিক) দলীল:** আর আকলী বা বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল হচ্ছে— সিফাত বা গুণের ক্ষেত্রে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার কোনো সাদৃশ্য থাকা সম্ভব নয়। কেননা স্রষ্টার ক্ষেত্রে তা এক ধরনের ঘাটতি বা ত্রুটি বলে বিবেচিত হবে।

◉ **মানবেন্দ্রিয়ভিত্তিক দলীল:** আর মানবেন্দ্রিয়ভিত্তিক দলীল হচ্ছে— প্রত্যেক মানুষ মাখলূকের হাতকে বড়, ছোট, বিশালাকার, সরু, পাতলা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখতে পায়। কাজেই মাখলূকের হাতের ক্ষেত্রে এই বৈপরীত্য ও ভিন্নতা থাকার বিষয়টি অপরিহার্য করে যে, মহান আল্লাহর হাতও মাখলূক থেকে ভিন্ন। আর মাখলূকের হাতের সাথে সাদৃশ্য না থাকাটা স্রষ্টার ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রাধান্য পাবে। **(দেখুন ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ্‌র 'শারহুল আকীদাতিল ওয়াসেত্বিয়্যাহ', খণ্ড: ১, পৃ: ৩০৪)**

৩০৪. ইমাম দারাকুৎনী হাদীসটিকে 'আস-সিফাত' কিতাবে (পৃ: ৪৫) উল্লেখ করেছেন যা শাইখ আল-ফাকিহী তাহকীক করেছেন। আর ইমাম বায়হাকী একে মারফূ' সূত্রে হারিস ইবন নাওফাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে 'আল-আসমা ওয়াস সিফাত' কিতাবে (পৃ: ৪০৩) উল্লেখ করেছেন। ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে সহীহ সানাদে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন:

خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش، والقلم، وآدم، وجنة عدن. ثم قال لسائر الخلق: كن. فكان

"মহান আল্লাহ ৪টি জিনিসকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন: আরশ, কলম, আদম এবং

কাজেই এই ৩টি জিনিসকে খাসভাবে উল্লেখ করা এবং একই সাথে বাকি সকল সৃষ্টির মত এগুলো মহান আল্লাহর কুদরতের মাধ্যমে সৃষ্টি হওয়ার দ্বারা বুঝা যায় যে, এই ৩টি জিনিসের অতিরিক্ত একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এখানে 'يَدَيْنِ' শব্দটি দ্বিবচন। প্রকৃত হাত ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যবহার আছে বলে জানা যায় না। কুদরত বা নিয়ামত অর্থে এটি কখনো ব্যবহৃত হয় না। এজন্য এটা বলা জায়েয হবে না যে, মহান আল্লাহ তাঁর দু'টি ক্ষমতার মাধ্যমে কিংবা তাঁর দু'টি নিয়ামতের মাধ্যমে সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। 'يَدَيْنِ' (দুই হাত) শব্দটিকে নিয়ামত, কুদরত কিংবা অন্য কোনো অর্থে প্রয়োগ করা জায়েয হবে না। তবে যার প্রকৃতপক্ষে দু'টি হাত রয়েছে তার জন্যই কেবল 'يَدَيْنِ' শব্দটিকে প্রয়োগ করা জায়েয হবে। এজন্য এটা বলা যাবে না যে, বাতাসের হাত রয়েছে কিংবা পানির হাত রয়েছে[৩০৫]।

জান্নাতু আদন। অতঃপর তিনি বাকি সকল সৃষ্টিকে বলেন, 'হও'। আর সব হয়ে গেল"।

ইমাম যাহাবী 'আল-উলু' কিতাবে বলেন: এর সানাদ উত্তম। শাইখ আলবানী 'মুখতাসারুল উলু' কিতাবে (পৃ: ১০৫) বলেন: এর সানাদ ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ।

৩০৫. মু'আত্ত্বিলাহ সম্প্রদায়ের মধ্যে মু'তাযিলাহ, জাহ্‌মিয়্যাহ, আশ'আরী এবং অন্যান্য সম্প্রদায় মহান আল্লাহর হাত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিরোধিতা করে থাকে। তারা বলে: এটা অসম্ভব যে, আমরা মহান আল্লাহর জন্য প্রকৃতপক্ষে কোনো হাত সাব্যস্ত করবো। বরং 'يد' দ্বারা এর অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্দেশ্য, আর তা হলো শক্তি বা ক্ষমতা। অথবা 'يد' দ্বারা নিয়ামত উদ্দেশ্য। যেহেতু আরবী ভাষায় 'يد' শব্দটি শক্তি বা নিয়ামত বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন নাওওয়াস ইবন সাম'আন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ সহীহ হাদীসে রয়েছে,

إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ

"এমন সময় মহান আল্লাহ ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর প্রতি এ মর্মে ওয়াহী অবতীর্ণ করবেন যে, আমি আমার এমন বান্দাদের আবির্ভাব ঘটেয়েছি, যাদের সঙ্গে কারোই যুদ্ধ করার হাত (ক্ষমতা) নেই। অতঃপর তুমি আমার মুমিন বান্দাদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যাও"। (মুসলিম: ২৯৩৭)

এর অর্থ হচ্ছে, যাদের সঙ্গে কারোই যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। আর তারা হলো ইয়া'জুজ এবং মা'জুজ। আর 'নিয়ামত' অর্থে 'يد' শব্দটি অনেক জায়গায় রয়েছে। যেমন আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে বলা কুরাইশ দূতের বক্তব্য:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لأَجَبْتُكَ

"যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাঁর কসম করে বলছি, আমার উপর যদি আপনার হাত

(অনুগ্রহ) না থাকতো, যার প্রতিদান আমি দিতে পারিনি, তাহলে নিশ্চয়ই আমি আপনার কথার জবাব দিতাম"। (বুখারী: ২৭৩১, ২৭৩২) অর্থাৎ যদি নিয়ামত বা অনুগ্রহ না থাকতো।

আর মুতানাব্বী নামক কবি বলেন:

وكم لظلام الليل عندك من يد ... تحدث أن المانوية تكذب

'তোমার নিকট কি পরিমাণ হাত (অনুগ্রহ) রাতের আঁধারের রয়েছে...
যা নির্দেশ করে, মানাউইয়্যাহ সম্প্রদায় মিথ্যা বলে থাকে'।

মানাউইয়্যাহ হচ্ছে অগ্নিপূজারী মাজূসী সম্প্রদায়ভুক্ত একটি দল যারা বলে: রাতের আঁধার মন্দ জিনিসগুলো সৃষ্টি করে। আর নূর বা আলো ভালো জিনিসগুলো সৃষ্টি করে। কবি মুতানাব্বী বলেন: তোমাকে রাতের বেলায় অনেক নিয়ামত দেওয়া হয়েছে, যা প্রমাণ করে, মানাউইয়্যাহ সম্প্রদায় মিথ্যা বলে থাকে। কেননা তোমার রাত কল্যাণ বয়ে আনে।

এজন্য মহান আল্লাহর 'يد' দ্বারা নিয়ামত উদ্দেশ্য এবং তা দ্বারা প্রকৃত হাত উদ্দেশ্য নয়। কেননা, যদি আপনি মহান আল্লাহর প্রকৃত হাত সাব্যস্ত করেন সেক্ষেত্রে এর মাধ্যমে মহান আল্লাহকে শারীরিক অবয়ব দেওয়া হবে এবং তিনি দৈহিক কাঠামো বিশিষ্ট সত্তাতে পরিণত হবেন। আর দৈহিক কাঠামোসমূহ একই ধরনের হয়ে থাকে। তখন মহান আল্লাহ যে বিষয়ে নিষেধ করেছেন, আপনি তাতে পতিত হবেন: 'فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ' (কাজেই তোমরা আল্লাহর কোনো সদৃশ স্থির করো না) (সূরা আন-নাহ্‌ল: ৭৪)

হে সিফাতসমূহের হাকীকত সাব্যস্তকারীগণ! তোমাদের চেয়ে আমাদের নিকট যে দলীল রয়েছে, তা নিয়ে আমরা অনেক সৌভাগ্যবান। সুমহান সেই সত্তা যিনি সবধরনের নশ্বর বস্তু, অংশ এবং প্রয়োজন থেকে পুরোপুরি মুক্ত। আপনি কুরআন-সুন্নাহতে এ ধরনের অন্ত্যমিলযুক্ত ছোট-ছোট বাক্য খুঁজে পাবেন না। [অপব্যাখ্যাকারীদের যুক্তি এখানেই শেষ]

আমরা কয়েকটি দিক থেকে এর জবাব দিবো:

(ক) 'يد' শব্দটির ব্যাখ্যা শক্তি বা নিয়ামত করাটা শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত। আর যা শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত, তা প্রত্যাখ্যাত। তবে দলীল থাকলে ভিন্ন কথা।

(খ) তা সালাফদের ইজমা'র বিপরীত। কেননা তাদের সকলেই এক্ষেত্রে একমত যে, 'يد' শব্দটি দ্বারা মহান আল্লাহর হাত তথা প্রকৃত হাত উদ্দেশ্য।

যদি কেউ আপনাকে বলে: এক্ষেত্রে সালাফদের ইজমা কোথায়? এ বিষয়ে আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কিংবা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আমার নিকটে একটি মাত্র বক্তব্য নিয়ে আসুন যে, তারা বলেছেন, 'يد' শব্দটি দ্বারা মহান আল্লাহর প্রকৃত হাত উদ্দেশ্য!

আমি তাকে বলি: আপনি আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কিংবা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এবং

মুজতাহিদ ইমামগণ থেকে আমার নিকটে একটি মাত্র বক্তব্য নিয়ে আসুন যে, তারা বলেছেন, 'يد' শব্দটি দ্বারা মহান আল্লাহর শক্তি বা নিয়ামত উদ্দেশ্য। সে কখনোই তা আনতে সক্ষম হবে না।

কাজেই তাদের নিকটে যদি এর আরো কোনো অর্থ থাকতো যা শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত, তারা তা বলতো। আর আমরাও তা উল্লেখ করতাম। আর যেহেতু তারা তা বলেনি, কাজেই জানা গেল যে, তারা শব্দের প্রকাশ্য অর্থকে গ্রহণকারী এবং এ বিষয়ে একমত পোষণকারী।

এটি অনেক বড় একটি ফায়দা। আর তা হলো— যখন কুরআন-সুন্নাহ্‌র প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত কোনো কিছু সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হয়নি এবং তারা এ ব্যতীত অন্য কোনো কিছু বলেননি। কেননা তারা ছিলেন এমন ব্যক্তি যাদের ভাষায় কুরআন মাজীদ নাযিল হয়েছিল এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের ভাষায় তাদের সাথে কথোপকথন করতেন। আর অবশ্যই তারা কুরআন-সুন্নাহকে এদের প্রকাশ্যে অর্থে বুঝতেন। যেহেতু এর বিপরীত কোনো কিছু তাদের থেকে বর্ণিত হয়নি, সেক্ষেত্রে সেটাই তাদের বক্তব্য (অর্থাৎ প্রকৃত হাত)।

(গ) এটি একেবারেই অসম্ভব যে, মহান আল্লাহর এই বাণীতে 'يد' শব্দটি দ্বারা নিয়ামত বা শক্তি বুঝানো উদ্দেশ্য: 'لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ' (যাকে আমি আমার দু'হাতে সৃষ্টি করেছি) (সূরা সাদ: ৮৫)। কেননা তা অপরিহার্য করে যে, সেখানে কেবল দু'টি নিয়ামত রয়েছে। অথচ মহান আল্লাহর নিয়ামত গুণে শেষ করা যাবে না! আর এটি অপরিহার্য করে যে, সেখানে কেবল দু'টি শক্তি রয়েছে। অথচ 'قوة' (শক্তি) শব্দটি একক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা বহুসংখ্যক হয়না। কাজেই এ ধরনের বাক্যগঠন 'يد' দ্বারা শক্তি বা নিয়ামত উদ্দেশ্য করার বিষয়ে চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

যেমন ধরুন, মহান আল্লাহর বাণী 'بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ' (বরং তাঁর উভয় হাতই প্রসারিত) (সূরা আল-মায়েদা: ৬৪) এর ক্ষেত্রে এটা সম্ভব যে, আয়াতে বর্ণিত দুই হাতকে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে নিয়ামত অর্থ নেওয়া যায়। কিন্তু তাঁর বাণী 'لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ' (যাকে আমি দু'হাতে সৃষ্টি করেছি) দ্বারা নিয়ামত অর্থ নেওয়া যাবে, এটা কখনোই সম্ভব নয়।

আর শক্তির বিষয়ে বলা যায়, এটা সম্ভব নয় যে, উভয় আয়াতে বর্ণিত 'দুই হাত' দ্বারা সামগ্রিকভাবে শক্তি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ 'بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ' (বরং তাঁর উভয় হাতই প্রসারিত) এবং 'لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ' (যাকে আমি দু'হাতে সৃষ্টি করেছি) আয়াত দু'টি তে। কেননা শক্তি বহুসংখ্যক হয় না।

(ঘ) যদি 'يد' দ্বারা শক্তি উদ্দেশ্য হতো, সেক্ষেত্রে ইবলীসের উপর আদম (আলাইহিস সালাম) এর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব থাকতো না। এমনকি গাধা এবং কুকুরের উপরও নয়। কেননা তাদের সকলকেই মহান আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি 'يد' দ্বারা শক্তি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ইবলীসের উপর আপত্তি করাটাও সঠিক হতো না। কেননা এক্ষেত্রে

মু'আত্বিলাহ সম্প্রদায় এক্ষেত্রে যে যুক্তি প্রদর্শন করে থাকে তা হলো— 'يَدٌ' (হাত) শব্দটি কিছু কিছু আয়াতে একবচন হিসেবে এসেছে। আর কিছু আয়াতে এটি বহুবচন হিসেবে এসেছে। তাদের এ ধরনের যুক্তির মাঝে কোনো দলীল নেই। কারণ অনেক সময় দুই হাত দিয়ে কোনো কাজ করা হয় কিন্তু বলার সময় শুধু 'হাত' শব্দটি উল্লেখ করা হয়। যেমন যদি বলা হয়: আমি আমার চোখ দিয়ে দেখেছি এবং কান দিয়ে শুনেছি, তখন এর উদ্দেশ্য হলো আমার দুই চোখ এবং দুই কান। অনুরূপভাবে বহুবচন কখনো কখনো দ্বিবচন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا "যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা কর (তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর), কারণ তোমাদের হৃদয় তো ঝুঁকে পড়েছে"[৩০৬]।

এখানে 'قُلُوبُكُمَا' (তোমাদের উভয়ের হৃদয়সমূহ) দ্বারা 'قَلْبَا كُمَا' (তোমাদের উভয়ের দু'টি হৃদয়) বুঝানো উদ্দেশ্য।

'يَدٌ' (হাত) শব্দটিকে কিভাবে কুদরত কিংবা নিয়ামত অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেখানে মহান আল্লাহর 'كَفٌّ' (হাতের তালু), 'إِصبَع' (অঙ্গুলি), 'يَمين' (ডানহাত), 'شِمال' (বামহাত), 'قَبْض' (হাতের মুঠো) এবং 'بَسط' (হাতের

ইবলীস বলতো: হে আমার রব! আমাকেও আপনার শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাহলে আমার উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে?

(ঙ) যদি বলা হয়: এই 'يد' বা হাত যা মহান আল্লাহ সাব্যস্ত করেছেন তা বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তা দ্বারা নিয়ামত কিংবা শক্তি অর্থ উদ্দেশ্য করা যাবে না। যেমন এক্ষেত্রে 'إِصبَع' (অঙ্গুলি), 'قَبْض' (হাতের মুঠো), 'بَسط' (হাতের প্রশস্ততা), 'كَفٌّ' (হাতের তালু), 'يَمين' (ডানহাত) ইত্যাদি শব্দগুলো এসেছে। এগুলো সবই 'يد' এর অর্থ শক্তি উদ্দেশ্য করাতে বাঁধাপ্রদান করে। কেননা শক্তিকে এসব গুণে গুণান্বিত করা যায় না।

কাজেই এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঐসকল তাহরীফকারী সম্প্রদায় যারা বলে 'يد' দ্বারা শক্তি উদ্দেশ্য, তাদের বক্তব্য বহুদিক থেকেই বাতিল।

আর এটা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহর সিফাতসমূহ গায়েব বিষয়ক খবরের অন্তর্ভুক্ত, যাতে আকলের কোনো স্থান নেই। কাজেই বিষয়টি যেহেতু এমন, সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে এসবের প্রকাশ্য অর্থে তা ছেড়ে দেওয়া এবং এর বিরোধিতা না করা। **(দেখুন ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহর 'শারহুল আকীদাতিল ওয়াসেত্বিয়্যাহ', খণ্ড: ১, পৃ: ৩০৪-৩০৮)**

৩০৬. সূরা আত-তাহরীম: ৪

প্রশস্ততা) ইত্যাদি সাব্যস্ত রয়েছে যা কেবল প্রকৃত হাতের ক্ষেত্রেই থাকা সম্ভব?![৩০৭]

দ্বিতীয় আয়াতে মহান আল্লাহ ইয়াহূদীদের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যারা তাদের রবের ব্যাপারে নিকৃষ্ট কথা বলেছে। তারা আল্লাহর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছে (আল্লাহ মাফ করুন) যে, তাঁর হাত রুদ্ধ অর্থাৎ ব্যয় করার ক্ষেত্রে কৃপণ। অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁর নিজের ক্ষেত্রে তাদের কথার বিপরীত সিফাত সাব্যস্ত করেছেন। তা হলো, দান করার ক্ষেত্রে তাঁর উভয় হাতই সুপ্রশস্ত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন। যেমন হাদীসে এসেছে: إِنَّ يَمِينَ اللَّهِ مَلْأَى سحَّاء الليلَ والنهارَ لَا تَغيضُها نَفَقةٌ "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর ডান হাত (প্রাচুর্যে) পরিপূর্ণ। দিবারাত্রি অনবরত খরচ করেও তা মোটেও কমে না"[৩০৮]।

---

৩০৭. আমি বলি: মহান আল্লাহর 'كَفّ' (হাতের তালু), 'إِصبَع' (অঙ্গুলি), 'يَمين' (ডানহাত), 'قَبْض' (হাতের মুঠো) এবং 'بَسط' (হাতের প্রশস্ততা) সবকিছুই বর্ণিত হয়েছে। আর 'شِمال' (বামহাত) এর বিষয়ে বলা যায়, হাফিয বায়হাকী বলেন: মহান আল্লাহর 'شِمال' (বামহাত) কথাটি দু'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যাদের একটিতে জাফর ইবনুয যুবাইর এবং অপরটিতে ইয়াযীদ আর-রুক্কাশী নামক বর্ণনাকারী রয়েছে। তারা উভয়েই পরিত্যাক্ত বর্ণনাকারী। তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে তা কিভাবে সহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হতে পারে যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে যে, মহান আল্লাহর উভয় হাতকে 'ইয়ামীন' হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। তবে মনে হয় যে ব্যক্তি তা বলেছে সে তার নিকট যে শব্দে এসেছে সেভাবেই সে অন্যকে পৌঁছে দিয়েছে কিংবা আরবদের ডানহাতের বিপরীতে বামহাত সাব্যস্ত করার যে রীতি রয়েছে সেখান থেকেও তা হতে পারে।

খাত্তাবী বলেন: মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত দুই হাতের সিফাতের ক্ষেত্রে 'শিমাল' বা বামহাতের বিষয়টি নেই। আর মুহাম্মদ ইবন খুযাইমাহ তার 'আস-সুন্নাহ' কিতাবে বলেন: আমাদের মাযহাব হলো মুহাদ্দিসগণ এবং সুন্নাহ্‌র অনুসারীদের মাযহাব.....শেষে তিনি বলেন: মহান আল্লাহর উভয় হাতই 'ইয়ামীন' বা ডানহাত, এতে 'শিমাল' বা বামহাত বলে কিছু নেই। ('শারহুস সাফারীনী', পৃ: ২৩৪, খণ্ড: ১, সর্বশেষ সংস্করণ থেকে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখিত)

আমি বলি: বামহাতের কথা ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে মারফূ' সূত্রে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। আর এর সানাদে উমর ইবন হামযাহ রয়েছে। ইমাম আহমাদ বলেন: তার হাদীসগুলো মুনকার (অস্বীকৃত)। আর নাসাঈ বলেন: সে দ্ব'ঈফ (দুর্বল বর্ণনাকারী)। তবে ইবনু হিব্বান তাকে 'আস-সিকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। **(দেখুন 'তা'লীকাতুশ শাইখ ইবনি উসাইমীন আলা শারহিল ওয়াসেত্বিয়্যাহ লিল হাররাস', পৃ: ৬-৭)**

(এ মাসআলাটি বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যায়, শাইখ আলাওয়ী আব্দুল কাদের আস-সাক্কাফ এর লেখা 'সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ'।) **[সম্পাদক]**

৩০৮. ইমাম বুখারী হাদীসটিকে 'কিতাবুত তাওহীদ' এ (অধ্যায়: 'মহান আল্লাহর বাণী: যাকে আমি আমার নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি', ফাতহুল বারী: ১৩/৩৯৩) (অধ্যায়: 'আর তাঁর আর্‌শ ছিল

আপনি দেখুন! যদি মহান আল্লাহর প্রকৃত দু'টি হাত না থাকতো তাহলে তাঁর দুই হাত প্রশস্ত বলার ব্যাখ্যাটা কি সঠিক হতো?

সাবধান, অপব্যাখ্যাকারীদের চেহারাগুলো বিকৃত হোক, লাঞ্ছিত হোক!

ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ'র সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

'يَد' (হাত): মহান আল্লাহর দুই হাত তাঁর অন্যতম একটি সত্তাগত গুণ এবং তাঁর জন্য যেভাবে শোভনীয়, সেভাবে প্রকৃত অর্থেই তা তাঁর জন্য সাব্যস্ত। যেভাবে ইচ্ছা তিনি উভয় হাতকে প্রসারিত করেন এবং যা ইচ্ছা তিনি তা দ্বারা কবজা করেন। মহান আল্লাহর দুই হাত থাকার দলীল হচ্ছে তাঁর বাণী, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ "বরং আল্লাহর উভয় হাতই প্রসারিত"[৩০৯]। আর তাঁর বাণী, مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ "আমি যাকে আমার দু'হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিল?"[৩১০]

মহান আল্লাহর দুই হাতের ব্যাখ্যা 'قوة' বা শক্তি দ্বারা করাটা জায়েয নয়। কেননা তা শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত, সালাফদের ইজমা'র বিপরীত এবং শরীয়তে এর কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। অধিকন্তু, আয়াতের বর্ণনাপ্রসঙ্গে এমন কিছু রয়েছে যা এরূপ ব্যাখ্যাকে নিষিদ্ধ গণ্য করে, আর তা হচ্ছে এর দ্বিবচন হওয়া। কারণ দ্বিবচনের শব্দরূপ দ্বারা মহান আল্লাহকে শক্তির গুণে গুণান্বিত করা যাবে না (অর্থাৎ এটা বলা যাবে না যে, মহান আল্লাহর দু'টি শক্তি রয়েছে)।

পানির উপর', ফাতহুল বারী: ১৩/৪০৩) এবং 'কিতাবুত তাফসীর' এ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম হাদীসটিকে 'কিতাবুয যাকাত' এ বর্ণনা করেছেন (অধ্যায়: 'খরচ করার উৎসাহপ্রদান', নাওয়াউয়ী: ৭/৮৪)। তিনি যে শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা হলো: يمين الله ملأى لا يغيضها سحَّاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه "মহান আল্লাহর ডান হাত (প্রাচুর্যে) পরিপূর্ণ। দিবারাত্রি অনবরত খরচ করেও তা মোটেও কমে না। একটু ভেবে দেখ! আসমান-যমীন সৃষ্টি থেকে এ পর্যন্ত তিনি যে বিপুল পরিমাণ ব্যয় করেছেন এতে তাঁর ডান হাতের প্রাচুর্য একটুও কমেনি"।

৩০৯. সূরা আল-মায়েদা: ৬৪

৩১০. সূরা সাদ: ৭৫